পরিবেশ ও বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
77/2, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-700 016

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

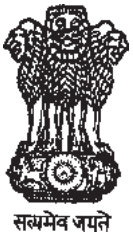

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, 1949 সালের 26 নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ দলিল দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির বিষয়-বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল হলো এই বইটি।

এই বিজ্ঞান বইটি অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে ও নামকরণ করা হয়েছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। অতীব সহজ সরল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ, ভৌত ও জীবনবিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিমুখ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্রের নকশা ব্যবহার করে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে তথ্য ভারাক্রান্ত না হতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা হয়েছে। লেখা ও ছবিগুলি যাতে শিশুমনে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে নজর রেখে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, কালি ও রং ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পর্ষদ প্রণীত 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে ও তাদের শিখন সামর্থ্য বাড়াবে। অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রথিতযশা শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাপ্রেমী শিক্ষাবিদ, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ — যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বইটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন সাহায্য করে পর্ষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

আশা করি পর্ষদ প্রকাশিত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নততর করতে সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রীরা উদবুদ্ধ হবে। এইভাবে সার্থক হবে পর্ষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন বিনা দ্বিধায় বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্ষদের নজরে আনেন যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বইটির মান উন্নত হবে এবং ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে যে, 'even the best can be bettered'। বইটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক সমাজের ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের গঠনমূলক মতামত ও সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান বইয়ের নাম 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুযায়ী জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ সমন্বিত আকারে একটি বইয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো। সহজ ভাষায় এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সহযোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বুনিয়াদি ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে আমরা উপস্থাপিত করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বইটি আকর্ষণীয় এবং প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা স্মরণে রেখেছি—'তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়।' (ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক)। ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম 'বিজ্ঞান' আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশে আর বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধানে ব্রতী হবে এবং উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ড. সন্দীপ রায় ড. শ্যামল চক্রবর্তী পার্থপ্রতিম রায় দেবব্রত মজুমদার

সুদীপ্ত চৌধুরী ড. ধীমান বসু রুদ্রনীল ঘোষ দেবাশিস মণ্ডল

নীলাঞ্জন দাস বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মজুমদার ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ডা. সুব্রত গোস্বামী

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্ত শিবপ্রসাদ নিয়োগী

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ—দেবাশিস রায়

অলংকরণ — দেবাশিস রায় ও শংকর বসাক

সহায়তা — হিরাব্রত ঘোষ, অনুপম দত্ত, বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	ভৌত পরিবেশ	
	1.1 বল ও চাপ	1-16
	1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল	17-28
	1.3 তাপ	29-45
	1.4 আলো	46-53
2.	মৌল, যৌগ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া	
	2.1 পদার্থের প্রকৃতি	54-78
	2.2 পদার্থের গঠন	79-91
	2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া	92-109
	2.4 তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব	110-117
3.	কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি	118-133
4.	কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ	134-159
5.	প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ	160-172
6.	দেহের গঠন	173-190
7.	অণুজীবের জগৎ	191-201
8.	মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন	202-227
9.	অন্তঃক্ষরা তন্ত্র ও বয়ঃসন্ধি	228-242
10.	পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ	243-279
11.	আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ	280-293
	পাঠ্যসূচি ও নমুনা প্রশ্ন	294-301
	শিখন পরামর্শ	302

অষ্টম শ্রেণির পরিবেশ ও বিজ্ঞান বই নিয়ে কিছু কথা

বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে মানুষ বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে। এক সময়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অনেক ধারণাই স্পষ্ট ছিল না। গ্রিক দার্শনিকদের যুগ থেকে শুরু করে মানুষের ধারণার বিবর্তনের পথে প্রধান সহায় ছিল পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আমাদের এই বইয়ে তাই পড়ার পাশাপাশি হাতেকলমে পরীক্ষা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু বিদ্যালয়স্তরের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, পরিপূরকরূপে চাই শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান বই। আমাদের এই বই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পথে যাত্রায় সহায়ক হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞানের প্রথাগত (Formal) ধারণায় দীক্ষিত করতে চাই, কিন্তু সে যাত্রায় আমরা অনুসরণ করব শিখনের Constructivist পন্থা। আজ সারা বিশ্বে পঠনপাঠনে অনুসৃত এই Constructivist পন্থার মূল কথা হলো শিক্ষার্থীকে তার পরিচিত জগৎ থেকে পাওয়া ধারণাগুলির সাহায্য নিয়ে ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষায় দীক্ষিত করা। যেহেতু বিজ্ঞানের সবকিছুই Intuitive নয়, তাই শিক্ষক/শিক্ষিকাকে Experiential Learning, Concept Learning ও Knowledge Construction- এর বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিখন পরিচালনা করতে হবে।

এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমন্বয়ী প্রচেষ্টার (Integrated Approach) ফসল। আমরা মনে করি দুটি প্রচ্ছদের মধ্যে জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত করলেই সমন্বয় সাধিত হয় না। বিষয়গুলির মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন এবং মেলবন্ধনের চেষ্টাই এই বইটিকে অন্য মাত্রা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিজ্ঞানের পথে মানুষের যাত্রার ইতিহাস বিচিত্র। বহু আত্মত্যাগ-সাফল্য-বিফলতা-উপেক্ষা-সামাজিক অপমানের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। আমরা চেয়েছি ছোটোবেলা থেকেই কিশোর-কিশোরীরা বরেণ্য বিজ্ঞানীদের কথা জানুক, তাঁদের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস থেকে প্রেরণা লাভ করুক। তাঁদের আত্মত্যাগ ছাড়া আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হতো না। অনেকক্ষেত্রেই তাই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছবি সংযোজিত হয়েছে।

একবিংশ শতকে পৃথিবীর ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র্যের প্রতি নবীন শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে এই বইতে জীববৈচিত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হলো।

বিজ্ঞানে তথ্যানুসন্ধান ও সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এই বইয়ের পাঠক ও পাঠিকাদের বহুক্ষেত্রেই Open-ended প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এই ধরনের প্রশ্ন/কর্মপত্রগুলি ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণে উৎসাহী করে তুলতে সংযোজিত হয়েছে। এটিও এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বইটি সম্বন্ধে যে-কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

1.1 বল ও চাপ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা **বল** সম্বন্ধে জেনেছ। **বল** প্রয়োগ ছাড়া আমরা কোনো কাজই যে করতে পারি না, তা দেখেছ। কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে, কোনো গতিশীল বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করতে বা ওই গতিকে আরও দ্রুত বা মন্থর করতে আমাদের **বল** প্রয়োগ করতে হয়। শুধু কী তাই? কোনো বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতেও **বল** দরকার। একটি স্প্রিংকে সংকুচিত করে ছোটো করা বা প্রসারিত করে লম্বা করা, **বল** প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের শরীরের মধ্যেও এরকম কত **বল** যে কত জায়গায় কাজ করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়! যখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমাদের সারা শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে, হাড়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় **বল** কাজ করে বলেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তোমরা যদি তোমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা নানারকম ঘটনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, দেখবে **বলের** ক্রিয়ার এরকম আরো অনেক কথা তোমাদের মাথায় আসবে। কোথায় কীভাবে **বল** ক্রিয়া করছে তা ভেবে মজা পাবে।

বল ও **গতি** বিষয়ে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন আমাদের যে তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন, তার সম্বন্ধেও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ। চলো আরো একবার দেখি ওই সূত্রগুলো থেকে আমরা ঠিক কী শিখেছি।

- প্রথম সূত্র থেকে আমরা শিখেছি, একটি বস্তুর ওপর কোনো **বল** কাজ করছে কিনা তা বুঝতে বস্তুটির বেগ বদলাচ্ছে কিনা তা দেখতে হয়। বস্তুর বেগ না বদলালে বা বস্তুটি থেমে থাকলে বুঝতে হবে যে বস্তুটির ওপর কোনো **বল** কাজ করছে না, বা বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল **বল**গুলির যোগফল শূন্য।
- দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা শিখেছি কোনো বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা **বল** যত জোরালো হবে, প্রতি সেকেন্ডে ওই বস্তুর বেগের পরিবর্তন, মানে **ত্বরণ**ও তত বেশি হবে। **বল** যদি দ্বিগুণ হয়, ওই বলের জন্য উৎপন্ন **ত্বরণ**ও দ্বিগুণ হবে।
- তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা এটা বুঝেছি যে, যখন একটি বস্তু অন্য আর একটি বস্তুর উপর কোনো **বল** প্রয়োগ করে, তখন একই সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির উপর উলটো দিকে **সম মানের বল** প্রয়োগ করে। এই দুটি বলের একটিকে যদি বলি **ক্রিয়া** তবে অন্য **বল**টিকে বলা হয় **প্রতিক্রিয়া**।

এখন প্রশ্ন হলো, এই **বল** মাপা হবে কীভাবে? কোন **বল** বেশি আর কোনটা কম তা জানব কীভাবে?

বলের পরিমাপ ও একক

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে **বল**-এর পরিমাণ জানতে ওই **বল**-এর প্রভাবে কী ঘটল তার হিসেব করতে হয়। টেবিলের ওপর একটি বই রেখে সেটিকে হাত দিয়ে তুমি একবার ধাক্কা দিলে আর একবার তোমার বন্ধু ধাক্কা দিল। যে ধাক্কার জন্য ওই থেমে থাকা বইটিতে বেশি বেগের সৃষ্টি হলো, তাতে নিশ্চয়ই বল প্রয়োগ করা কালীন বেশি ত্বরণ সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে সেই ধাক্কাতে বইটিতে নিশ্চয়ই বেশি বল প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপরে কতটা বল প্রয়োগ করা হলো তা এভাবেই বলের প্রভাব দেখে, অর্থাৎ ত্বরণ মেপে, হিসেব করতে হয়। নিউটনের সূত্র থেকে এব্যাপারে আমরা একটি সমীকরণও

পেয়েছি—

বল = বস্তুর ভর × বলের প্রভাবে বস্তুতে উৎপন্ন ত্বরণ

$F = m \times a$ [যেখানে F = বল, m = ভর এবং a = ত্বরণ]

একটি এক কেজি ভরের বস্তুর ওপর যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বস্তুটিতে এক মিটার/সেকেন্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হয়, সেই পরিমাণ বলকে **এক নিউটন** বল বলা হয়। এই এক নিউটন হলো SI পদ্ধতিতে বল মাপার একক। নিউটনকে **N** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তুমি যখন একটি এক কেজি ভরের বাটখারাকে হাতে ধরে রাখো তখন তোমার হাতে ওই বাটখারাটি যে বল প্রয়োগ করে তার মাপ হলো প্রায় 9.8 নিউটন।

আমরা দেখলাম, আইজ্যাক নিউটনের দেওয়া সমীকরণ ব্যবহার করে যদি বল মাপতে হয় আমাদের **ত্বরণ** -এর মান জানা চাই। কিন্তু হাতে ধরে থাকা বাটখারাটি বা তোমার হাত দুই-ই তো স্থির— কোনো ত্বরণ নেই। এক্ষেত্রে বল মাপার উপায় কী ? কিংবা ধরা যাক, সুতো (বা দড়ি)-তে একটি ইটের টুকরোকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছ। আর সুতোর অন্য মাথাটা তুমি ধরে আছ। তুমি দেখছ ইটের টুকরোটা স্থির সেটির কোনো ত্বরণ নেই। অথচ হাতে ধরে বেশ বুঝতে পারছ যে ইটের টুকরোটা সুতোটাকে নীচের দিকে টানছে। তোমার হাতে টান পড়ছে। এক্ষেত্রেই বা বল মাপা হবে কীভাবে?

হাতে ধরা বাটখারা বা সুতোয় ঝোলানো ইট— এই দুটোর ওপরেই পৃথিবীর টান নীচের দিকে। এই টানকে আমরা বলি অভিকর্ষ বল বা বস্তুর ওজন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে এটা তোমরা জেনেছ। আমরা নিউটনের সূত্র থেকে এটাও জেনেছি যে বল প্রয়োগ হলে ত্বরণ সৃষ্টি হবেই।

তাহলে ভেবে দেখো বাটখারা বা ইটের টুকরো স্থির রয়েছে কেন? অভিকর্ষ বল প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয়নি কেন? ওদের ওপর কি তাহলে অন্য কেউ পৃথিবীর টানের উলটোদিকে কোনো সমান বল প্রয়োগ করেছে?

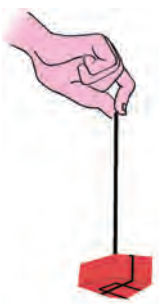

ঠিক ধরেছ। বাটখারার ক্ষেত্রে তোমার হাত, আর ইটের টুকরোর ক্ষেত্রে সুতো এই উলটো বল প্রয়োগ করছে। পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে যখন বাটখারা বা ইটের টুকরো নীচের দিকে যেতে চাইছে তখন বাটখারাটি হাতের ওপর, আর ইটের টুকরোটি সুতোর ওপর নীচের দিকে একটি বল প্রয়োগ করছে। ফলে, নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, হাতও বাটখারার ওপর নীচ থেকে উপরের দিকে এবং সুতোও ইটের ওপর নীচ থেকে উপরের দিকে সমান মানের বল প্রয়োগ করছে। তাই দুটি সমান বল উলটো দিকে কাজ করায় ইট বা বাটখারার উপর মোট বলের মান শূন্য হয়ে গেছে। ফলে কোনো ত্বরণ তৈরি হয়নি।

ত্বরণ তৈরি না হলেও দুটি সমান মানের বল উলটোদিকে কাজ তো করছে। এই বল দুটিকে মাপার উপায় কী?

চলো একটা পরীক্ষার কথা জানা যাক।

একটি স্প্রিং নেওয়া হলো। সেটিকে কোনো একটি হুক থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এবার যদি স্প্রিংটির অন্য প্রান্ত থেকে একটা ভারী বাটখারা বা পাথরের টুকরো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে, স্প্রিংটি একটু লম্বা হয়ে গেছে। আগের বাটখারার বদলে, তার দ্বিগুণ ভারী একটা বাটখারা বা অন্য কিছু ঝুলিয়ে দিলে কী দেখা যাবে? স্প্রিংটা আগের থেকে বেশি লম্বা হয়ে যাবে কি? বেশি ভারী বস্তু ঝোলালে স্প্রিং

-এর প্রসারণের পরিমাণও যে বেশি হয় এটা নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। খুঁটিয়ে নজর করলে দেখবে যে, দ্বিগুণ ভরের বস্তু ঝোলালে স্প্রিং-এর প্রসারণও দ্বিগুণ হয়।

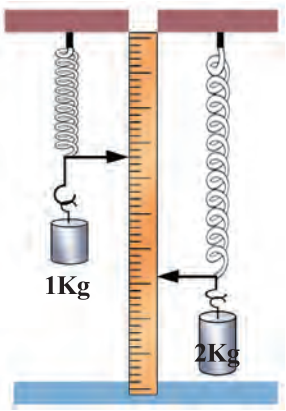

স্প্রিং থেকে ঝোলানো বাটখারা বা ভারী পাথরের টুকরো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কোনো ত্বরণ থাকে না। কিন্তু সেই ঝুলন্ত বস্তুটি স্প্রিং-এর ওপর যে বল প্রয়োগ করে, তার প্রভাবে স্প্রিংটি দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়।

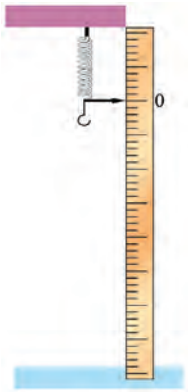

স্প্রিং-এর ওপর প্রয়োগ করা বল বেশি হলে, স্প্রিং-এর প্রসারণের মানও বেশি হয়— এই ঘটনাকে আমরা বল মাপার কাজে ব্যবহার করতে পারি।

পাশের ছবিতে একটি স্কেল ও একটি ঝুলন্ত স্প্রিং পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে। স্প্রিং-এর ঝুলন্ত প্রান্তে ছবির মতো একটি কাঁটা বা সূচক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার স্প্রিং-এর ঝুলন্ত প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ওজন ঝুলিয়ে দিয়ে দেখা হচ্ছে যে কাঁটা বা সূচকটি স্কেলের কোন দাগে থাকে। এভাবে বিভিন্ন ওজনের জন্য সূচকের বিভিন্ন পাঠ পাওয়া সম্ভব। যখন কোনো ওজন ঝোলানো হয়নি তখন স্প্রিং-এর ওই সূচক যেখানে থাকে, তাকে শূন্য নাম দেওয়া হয়। যখন 1 কেজি ভরের কোনো বস্তুকে ঝোলানো হয় তখন ওই সূচক যেখানে নেমে আসে সেখানকার পাঠকে নাম দেওয়া হয় 1 কেজি বা 9.8 নিউটন। অর্থাৎ সূচকের অবস্থান দেখে বুঝতে হবে যে, 1 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী যে বল দিয়ে টানে, ঠিক সেই পরিমাণ বল স্প্রিংটির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে 2 কেজি, 3 কেজি ইত্যাদি বিভিন্ন ভরের বস্তুর জন্য স্প্রিং-এর সূচকের অবস্থান দেখে স্প্রিং-এর ওপর কত বল প্রয়োগ করা হয়েছে তা মাপা যায়। বল প্রয়োগের ফলে স্প্রিং-এর এই প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে বল মাপার যন্ত্র **স্প্রিং তুলা** তৈরি করা হয়েছে।

ধরা যাক, তুমি স্প্রিং তুলাকে দু-দিক থেকে টানলে আর স্প্রিং তুলার কাঁটা 3 কেজি পাঠ দেখাল।

এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো যে তুমি স্প্রিং তুলাকে যে বল দিয়ে দু-দিকে টেনেছ, সেই বলের প্রতিটির পরিমাণ একটি 3 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী যে বল দিয়ে টানে তার সঙ্গে সমান। এই বলের মান (3×9.8) নিউটন বা 29.4 নিউটন।

ঘর্ষণ ও তার পরিমাপ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা ঘর্ষণ বল সম্বন্ধে জেনেছ। এখানে আমরা দেখব ঘর্ষণ বলের হিসেব কীভাবে করা হয়।

টেবিলের ওপর একটি বাক্স রাখা আছে। আর তুমি একটি স্প্রিং তুলার সাহায্যে বাক্সটিকে টানছ। স্প্রিং তুলা দিয়ে টানার ফলে তুমি কত জোরে টানছ তা মাপতে পারছ। ধরা যাক, স্প্রিং তুলার কাঁটা 1 কেজি বা 9.8 নিউটনের দাগে আছে। অর্থাৎ তুমি বাক্সটিকে 9.8 নিউটন বল দিয়ে ডান দিকে টানছ। যদি এই টান সত্ত্বেও

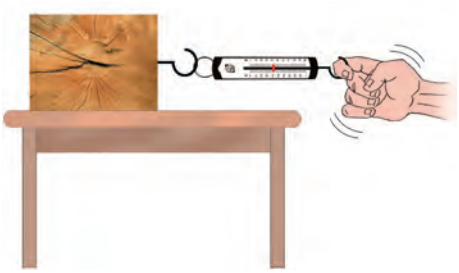

বাক্সটি স্থির থাকে ও ডানদিকে না সরে, তা হলে নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? বাঁ দিকে বাক্সটির উপর নিশ্চয়ই কেউ 9.8 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে—যার ফলে বাক্সটির উপর মোট বল শূন্য হয়েছে। এখন প্রশ্ন, বাঁ দিকের এই 9.8 নিউটন বল কে প্রয়োগ করল?

এবার যদি তুমি ওই বাক্সটিকে অন্য একটি টেবিলের ওপর বসাও, যে টেবিলের ওপরের তলটি আরো মসৃণ ও পিচ্ছিল, তাহলে হয়তো দেখবে যে ওই 9.8 নিউটন বল দিয়ে টানলেই বাক্সটি ডান দিকে সরে যাচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথম টেবিলের ক্ষেত্রে বাঁ দিকের ওই বল টেবিলের উপরিতলই প্রয়োগ করেছিল। যখন টেবিল বদলানো হলো ও পিচ্ছিল তলের ওপর বাক্সটি বসানো হলো, তখন নতুন টেবিলের তল ওই সমপরিমাণ বল (9.8 নিউটন) প্রয়োগ করতে পারেনি। অতএব বোঝা গেল বাক্সটি টানতে গেলেই বাক্সটির নীচের তল, আর টেবিলের উপরের তল—এই দুয়ের সংস্পর্শে একটি বলের জন্ম হয়েছে। বাক্সটিকে টানা মাত্রই ওই বল টানের উলটোদিকে ক্রিয়া করতে শুরু করেছে ও বাক্সটিকে সরতে বাধা দিতে চেয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে ওই বলের মান আর টানের মান সমান। 9.8 নিউটন। তাই প্রথম ক্ষেত্রে দুটি বলের যোগফল শূন্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওই বলের মান টানের চেয়ে কম। ফলে বাক্স টানের দিকে সরে গিয়েছে। দুটি তলের সংস্পর্শে তৈরি হওয়া এই বলটি যা গতি বা গতি উৎপন্ন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয় তার নামই হলো ঘর্ষণ বল।

এবার বলোতো, প্রথম ক্ষেত্রে ওই ঘর্ষণ বলের মান কত?

ঠিকই ধরেছ। প্রথম ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মান 9.8 নিউটন, অর্থাৎ যে বল দিয়ে ডান দিকে টানা হয়েছে তার সমান।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে?

কোনো তলের ওপর স্থির থাকা কোনো বস্তুকে ওই তলের সঙ্গে সমান্তরালে টানা সত্ত্বেও যদি সেটি না সরে, তবেই আমরা বলতে পারি যে ঘর্ষণ বলের মান, টানের মানের সমান। যদি টানের মান স্প্রিং তুলার সাহায্যে জানা সম্ভব হয় তাহলে ঘর্ষণ বলের মানও জানা সম্ভব হয়।

কিন্তু বস্তুটি যদি টানের কারণে চলতে শুরু করে সেক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মান এভাবে শুধু স্প্রিং তুলার পাঠ দেখে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যদিও সেক্ষেত্রেও ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে।

বল প্রয়োগ করে টানা সত্ত্বেও যখন কোনো বস্তু কোনো তলের ওপর স্থির হয়ে থাকে, তখন যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তার নাম স্থির অবস্থার ঘর্ষণ। আর যখন টানার কারণে বস্তুটি চলতে থাকে তখন যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তার নাম গতিশীল অবস্থার ঘর্ষণ।

এবার পাশের ছবিগুলি লক্ষ করো।

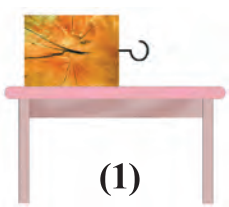

(1)

1 নং ছবিতে বাক্সটিকে কেউ টানছে না। ভেবে বলো, এখানে কি বাক্সটির ওপর কোনো ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করছে?

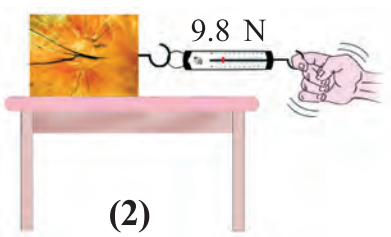

(2)

2 নং ছবিতে বাক্সটিকে 9.8 নিউটন বল দিয়ে টানা হয়েছে। কিন্তু বাক্সটি স্থির রয়েছে। এখানে ঘর্ষণ বলের মান কত?

ঘর্ষণ বলটি এক্ষেত্রে কোন দিকে ক্রিয়া করছে?

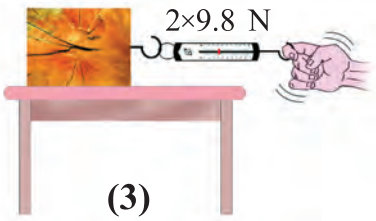

(3)

3 নং ছবিতে বাক্সটিকে (2×9.8) নিউটন বল দিয়ে টানা হচ্ছে। তবুও বাক্সটি সরছে না। এক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মান কত আর দিক কোনটি?

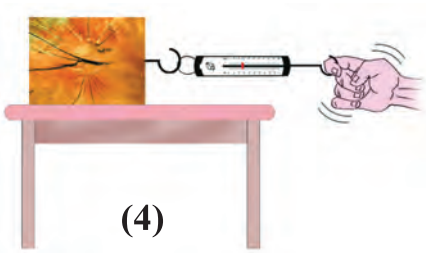
(4)

4 নং ছবিতে বাক্সটিকে (3×9.8) নিউটন বল দিয়ে ডানদিকে টানা হচ্ছে ও বাক্সটি ডান দিকে সবে চলতে শুরু করছে। এক্ষেত্রে শুধু স্প্রিং তুলার পাঠ দেখে ঘর্ষণ বলের মান কি নির্ণয় করা সম্ভব?

উপরের পরীক্ষাগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

কোনো একটি বস্তুকে টানা সত্ত্বেও যখন সেটি একটি তলের ওপর স্থির থাকে তখন ওই ঘর্ষণ বলের মান কি নির্দিষ্ট, নাকি বিভিন্ন মানের টানের জন্য বিভিন্ন?

বস্তুর ওপর টানের মান	স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের মান
শূন্য	
5.0 নিউটন	
7.5 নিউটন	
9.8 নিউটন	

যদি স্থির বস্তুটির ওপর টানের মান ধাপে ধাপে বাড়ানো হয় তাহলে স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের মান কেমন হবে তা পাশের সারণিতে লেখো।

যদি বস্তুটির ওপর টান ক্রমাগত বাড়ানো হতে থাকে তাহলে উলটোদিকে ঘর্ষণ বলের মানও কি ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে? না কি ঘর্ষণ বল একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই বাড়বে, ও তারপর বস্তুটি আর স্থির না থেকে সরতে শুরু করবে?

পাশের ছবিতে আরো দুটো পরীক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। একটি বস্তুকে একটি কাঠের টেবিলের ওপর রেখে টানা হচ্ছে। যতক্ষণ বস্তুটি না সরে ততক্ষণ টানের মান বাড়ানো হচ্ছে। স্প্রিং তুলার কাঁটা দেখে আমরা সহজেই বিভিন্ন সময়ে ঘর্ষণ বলের মান কত তা জানতে পারি। এমন কী ঠিক কত পরিমাণ টান দিলে বস্তুটি প্রথম সরতে শুরু করবে তাও স্প্রিং তুলার সূচক দেখে নির্ণয় করতে পারি। অর্থাৎ ওই বস্তুটি ওই তলের ওপর থেমে থাকা অবস্থায় ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান কত, অর্থাৎ ঘর্ষণ বল বাড়তে বাড়তে সবচাইতে কত বেশি হয়েছিল, তা স্প্রিং তুলার ওপর নজর রেখে নির্ণয় করা সম্ভব।

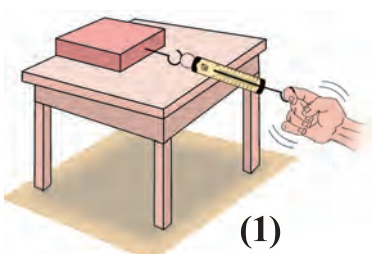
(1)

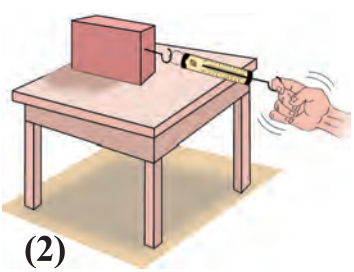
(2)

ধরা যাক, 1 নং ছবির মতো করে বস্তুটিকে রেখে একবার পরীক্ষা করা হলো ও স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করা হলো। তারপর ওই বস্তুটিকে 2 নং ছবির মতো রেখে পরীক্ষাটি আবার করা হলো ও স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান আবার নির্ণয় করা হলো। দেখা যাবে যে দুটি ক্ষেত্রেই স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান একই।

এবার ওই বস্তুটিকে একটি কাচের টেবিলের ওপর প্রথমে 1 নং ও তারপর 2 নং ছবির মতো করে রেখে পরীক্ষাগুলি আবার করা হলো। এবারেও দুটি ক্ষেত্রেই স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান একই পাওয়া যাবে। তবে এবারে পাওয়া ওই একই মান কিন্তু কাঠের টেবিলে থাকার সময়কার সর্বোচ্চ মানের সঙ্গে এক হবে না।

এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

- কোনো একটি বস্তু যখন একটি নির্দিষ্ট তলের ওপর স্থির থাকে, তখন ওই বস্তু ও ওই তলের মধ্যেকার স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান কি সবসময় একই থাকে, না ওই তলের সমান্তরালে দেওয়া টানের পরিমাণের সঙ্গে বদলায়?
- কোনো একটি বস্তুকে কীভাবে একটি তলের ওপর রাখা আছে, অর্থাৎ বস্তুটি তলের যে অঞ্চলকে স্পর্শ করে আছে, তার ক্ষেত্রফল বেশি না কম— তার ওপর কি ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান নির্ভর করে? স্পর্শতলের ক্ষেত্রফল বেশি হলে ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান কি বেশি হয়?

পাশের তিনটি ছবিতে টেবিলের ওপর একটি বাক্সকে তিনরকম অবস্থায় রেখে টানা হচ্ছে।

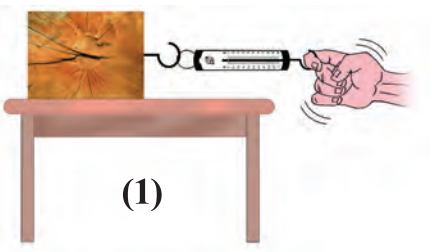
(1)

প্রথমে শুধু বাক্সটি বসিয়ে সেটি টানা হচ্ছে। তারপর বাক্সটির ওপর একটি 10 কেজির ভারী বাটখারা চাপিয়ে বাক্সটিকে টানা হচ্ছে। আর 3 নং ছবিতে বাক্সটির ওপর 2 টি 10 কেজি-র বাটখারা চাপিয়ে বাক্সটিকে টানা হচ্ছে।

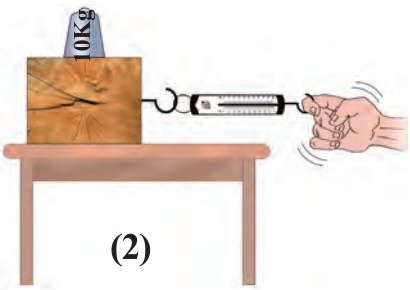

(2)

এই ছবিগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1 নং ছবিতে বাক্সটি টেবিলের ওপর নীচের দিকে যে বল প্রয়োগ করছে তা 2 নং ছবিতে টেবিলের ওপর বাক্সের দেওয়া নিম্নমুখী বলের চাইতে বেশি না কম?

3 নং ছবিতে টেবিলের ওপর বাক্সটি যে নিম্নমুখী বল প্রয়োগ করছে তার মান 2 নং ছবির টেবিলের ওপর বাক্সের দেওয়া নিম্নমুখী বলের চাইতে বেশি না কম?

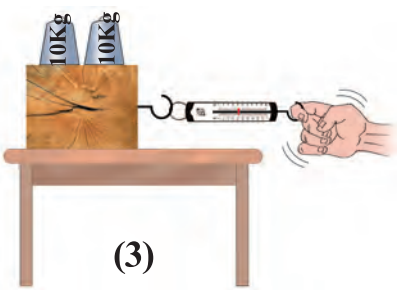

(3)

বাক্সটি যদি টেবিলের ওপর নীচের দিকে বল প্রয়োগ করে তাহলে টেবিলও নিশ্চয়ই বাক্সের ওপর উপরের দিকে সমান বল প্রয়োগ করছে। কারণ নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এমনটাই হবার কথা।

এবার বলো, কোন ছবির ক্ষেত্রে টেবিল বাক্সটির ওপর সবচাইতে বেশি ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করছে?

তিনটি ছবিতেই বাক্সটিকে ডানদিকে টানা হচ্ছে। ওই টান ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে যতক্ষণ না বাক্সটি চলতে শুরু করে। স্প্রিং তুলার কাঁটার দিকে নজর রেখে স্থির অবস্থার ঘর্ষণের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ছবিগুলি লক্ষ করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

- 1নং ও 2নং ছবির মধ্যে কোনটির ক্ষেত্রে টানের মান বেশি হলে তবে বাক্সটি চলতে শুরু করবে? স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান 1নং ও 2নং ছবির মধ্যে কোনটিতে বেশি?

● এবার 2 নং আর 3 নং ছবি তুলনা করে বলার চেষ্টা করো যে, কোন ক্ষেত্রে স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান বেশি হবে? অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে বাক্সটিকে সরাতে বেশি টান প্রয়োজন হবে?

উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে এবার নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও।

● কোনো বস্তু যখন কোনো তলের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকে, তখন ওই বস্তুটি ওই তলের ওপর লম্বভাবে নীচের দিকে একটি বল প্রয়োগ করে এবং ওই তলটিও ওই বস্তুটির ওপর লম্বভাবে উপরের দিকে সমান বল প্রয়োগ করে। এই লম্বভাবে প্রয়োগ করা বল যদি বেশি হয় তাহলে ওই বস্তু ও ওই তলের মধ্যেকার স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মানও কি বেশি হবে?

ঘর্ষণ বল সম্পর্কে আমরা যা যা জানলাম তা নীচে লিখে ফেলা যাক।

একটি তলের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকা একটি বস্তুকে যখন সরানোর চেষ্টা করা হয়, বা ওই তলের ওপর দিয়ে বস্তুটি যখন চলতে থাকে তখন ঘর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হয়।

ঘর্ষণ বল সবসময় সংস্পর্শে থাকা তলদুটির সঙ্গে সমান্তরালে ক্রিয়া করে।

টানা বা যে কোনো ধরনের বল যেমন ঠেলা, ধাক্কা ইত্যাদির প্রয়োগ সত্ত্বেও একটি বস্তু যখন একটি তলের ওপর স্থির থাকে তখন যে ঘর্ষণ বলটি ক্রিয়া করে তার নাম **স্থির অবস্থার ঘর্ষণ**।

স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের একটি সর্বোচ্চ মান আছে। এই সর্বোচ্চ মান একটি নির্দিষ্ট বস্তু, একটি নির্দিষ্ট তলের ওপর থাকার সময়, সর্বদা একই থাকে।

দুটি তলের মধ্যে উল্লম্বভাবে ক্রিয়াশীল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বল যত বেশি হয়, ওই তলের সমান্তরালে ক্রিয়াশীল স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মানও তত বেশি হয়।

তরলের ঘনত্ব ও চাপ

একই মাপের দুটি প্লাস্টিকের বোতল নাও। এবার একটি বোতল জল দিয়ে ভরতি করো। অন্য বোতলটি গাঢ় নুনজল দিয়ে ভরতি করো।

একটি স্প্রিং তুলা দিয়ে দুটি বোতলকেই আলাদাভাবে ঝুলিয়ে দেখো কোনটি বেশি ভারী।

খালি অবস্থায় দুটি বোতল সবদিক থেকে একই রকম। দুটি বোতলের ভিতরে একই পরিমাণ জায়গা আছে। তাহলে ভরতি বোতল দুটির একটি বেশি ভারী হলো কেন?

একই পরিমাণ গাঢ় নুনজল আর সাধারণ জলের মধ্যে গাঢ় নুনজল বেশি ভারী হয়েছে। তাহলে এক চামচ গাঢ় নুনজল নিশ্চয়ই এক চামচ সাধারণ জলের চাইতে ভারী হবে। একইভাবে এক বাটি গ্লিসারিন ও এক বাটি সাধারণ জলের চাইতে ভারী। তাই এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে, গাঢ় নুনজলের ভর ওই সমান আয়তনের সাধারণ জলের চাইতে বেশি। অতএব, একক আয়তনের গাঢ় নুনজলের ভর একক আয়তনের সাধারণ জলের ভরের চাইতে বেশি। একক আয়তন বলতে আমরা সেই আয়তনকে বুঝি যার মান হলো এক (1)। যেমন 1 লিটার, 1 ঘন সেমি, 1 গ্যালন। এরা সবাই একক আয়তন। একক আয়তনের বস্তুর ভরকে ওই বস্তুর ঘনত্ব বলে।

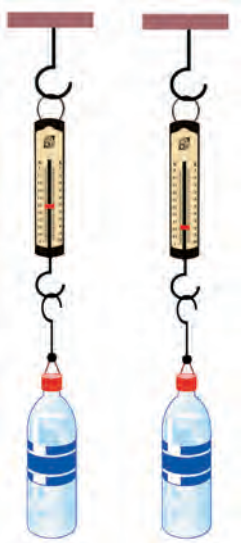

সাধারণ জল গাঢ় নুনজল

অতএব গাঢ় নুনজলের ঘনত্ব সাধারণ জলের ঘনত্বের চাইতে বেশি। তাই এক বোতল গাঢ় নুনজলের ভর একই মাপের এক বোতল সাধারণ জলের চাইতে বেশি হয়েছে, ফলে গাঢ় নুনজলের বোতল বেশি ভারী। ধরা যাক, বোতলটির আয়তন 1 লিটার। জল ভরার আগে ফাঁকা বোতলটি স্প্রিং তুলায় ঝোলানো হলো এবং স্প্রিং তুলার কাঁটা নীচে নামল না। অতএব ধরে নিতে পারি যে বোতলটির ভর এত কম যে তা শূন্য ধরে নেওয়া যায়। এবার জল ভরতি করে বোতলটিকে আবার স্প্রিং তুলা থেকে ঝোলানো হলো। এবার তুলার কাঁটা 1 কেজির দাগে এসে নামল। 1 লিটার আয়তনের জলের ভর পাওয়া গেল 1 কেজি অর্থাৎ জলের ঘনত্ব হলো 1 কেজি/ লিটার। এখন, যদি আমরা ভর মাপার জন্য গ্রাম ও আয়তন মাপার জন্য ঘন সেমি. এককটি ব্যবহার করি তাহলে জলের ঘনত্ব কত হবে?

1 লিটার জল = 1000 ঘন সেমি জল।

1 কেজি জল = 1000 গ্রাম জল।

অতএব লিখতে পারি,

1000 ঘন সেমি জলের ভর 1000 গ্রাম।

$$1 \text{ ঘন সেমি জলের ভর} = \frac{1000}{1000} \text{ গ্রাম}$$

$$\text{ফলে জলের ঘনত্ব} = \frac{\text{জলের ভর}}{\text{জলের আয়তন}} = \frac{1000 \text{ গ্রাম}}{1000 \text{ ঘন সেমি}}$$

$$= 1 \text{ গ্রাম/ ঘন সেমি।}$$

এবার নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

- একটি 2 লিটার মাপের বোতল একটি তরল দিয়ে পুরোপুরি ভরতি করা হলো। স্প্রিং তুলায় ঝুলিয়ে বোতলটির ভর পাওয়া গেল 4 কেজি। ধরে নেওয়া যাক ফাঁকা বোতলটি এত হালকা যে স্প্রিং তুলায় সেটি ঝোলালে স্প্রিং তুলার কাঁটা নীচে নামে না। বোতলে যে তরলটি নেওয়া হয়েছে তার ঘনত্ব কত?
- তোমরা কি কখনও পারদ দেখেছ? থার্মোমিটারের নীচের দিকে যে চকচকে কুণ্ডটি থাকে তার মধ্যে পারদ ভরতি করা থাকে। পারদ একটি তরল পদার্থ। পারদের ঘনত্ব খুব বেশি, 13.6 গ্রাম/ঘন সেমি.। বলতে পারো 1 লিটার পারদের ভর কত গ্রাম?

একটা বাটিতে কিছুটা জল নাও। এবার সামান্য সরষের তেল ওই বাটিতে ঢালো।

কী দেখতে পেলে?

সরষের তেল জলের উপরে ভেসে থাকল নাকি জলের নীচে গেল?

এবার বলোতো কোন তরলটির ঘনত্ব বেশি? জলের, নাকি সরষের তেলের? যদি এক লিটার জলের ভর এক কিলোগ্রাম হয়, তাহলে বলোতো এক লিটার সরষের তেলের ভর এক কিলোগ্রামের চেয়ে বেশি হবে না কম হবে?

তরলের চাপ

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা তরলের চাপ সম্বন্ধে পড়েছ। এটাও জেনেছ যে একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল ক্রিয়া করে তাকেই চাপ বলা হয়।

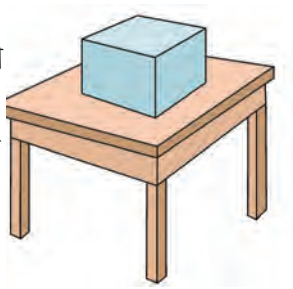

পাশের টেবিলের ওপর 10 কেজি ভরের একটি ব্লক রাখা আছে। ব্লকটিকে পৃথিবী কত বল দিয়ে নীচের দিকে টানছে?

1 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী 9.8 নিউটন বল দিয়ে টানে। তাহলে 10 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী (9.8×10) নিউটন বা 98 নিউটন বল দিয়ে টানছে।

98 নিউটন বল দিয়ে পৃথিবী নীচের দিকে টানা সত্ত্বেও লোহার ব্লকটি স্থির রয়েছে কেন বলতে পারো?

ব্লকটির ওপর পৃথিবীর টান যেহেতু নীচের দিকে, সেহেতু ব্লকটি টেবিলের ওপর নীচের দিকে ঠেলা দেয়। সেই ঠেলার মান ব্লকের ওজনের সমান অর্থাৎ 98 নিউটন। টেবিলের ওপর ব্লকের এই ঠেলাকে যদি বলি ক্রিয়া, তাহলে ব্লকের ওপর টেবিলের দেওয়া প্রতিক্রিয়া বলও 98 নিউটনই হবে এবং তার অভিমুখ হবে উপরের দিকে।

ফলে ব্লকটির ওপর পৃথিবীর দেওয়া 98 নিউটন নিম্নমুখী বল এবং টেবিলের দেওয়া 98 নিউটন ঊর্ধ্বমুখী বল -এর যোগফল শূন্য, এজন্যে ব্লকটিতে কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয়নি। তাই ব্লকটি স্থির রয়েছে।

এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে টেবিলের ওপর ব্লকের জন্য তৈরি হওয়া চাপের পরিমাণ কত?

আমরা দেখলাম যে টেবিলের ওপর ব্লক 98 নিউটন বল প্রয়োগ করছে। এবার জানতে হবে, টেবিলের ওপর কত ক্ষেত্রফল জায়গা জুড়ে এই বল প্রযুক্ত হয়েছে?

যদি টেবিল ও ব্লকের সংযোগতলের ক্ষেত্রফল হয় 0.25 বর্গমি. তাহলে টেবিলের ওপর ব্লকের দেওয়া বল 0.25 বর্গমি. ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত হয়েছে।

0.25 বর্গমি. ক্ষেত্রফলের ওপর দেওয়া বলের পরিমাণ যদি 98 নিউটন হয়,

তাহলে, 1 বর্গমি. ক্ষেত্রফল অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের ওপর

বলের পরিমাণ $= \frac{98 \text{ নিউটন}}{0.25 \text{ বর্গমি.}} = 392$ নিউটন/বর্গমি.

অতএব টেবিলের ওপর ব্লকের দেওয়া চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{98}{0.25}$ নিউটন/বর্গমি. $= 392$ নিউটন/বর্গমি.

এবার পাশের গামলাটি লক্ষ করো, যাতে 10 কেজি জল রয়েছে। গামলাটির মেঝের ক্ষেত্রফল 0.25 বর্গমিটার। গামলার মেঝের ওপর, অর্থাৎ গামলাটির তলদেশের ওপর জল যে চাপ দেয় তার পরিমাণ নির্ণয় করো।

10 কেজি জলকে পৃথিবী নীচের দিকে 10×9.8 নিউটন বা 98 নিউটন বল দিয়ে টানছে। অর্থাৎ 10 কেজি জলের ওজন 98 নিউটন। কিন্তু জল স্থির রয়েছে। অতএব গামলার মেঝে জলকে ওপরের দিকে 98 নিউটন বল দিয়েছে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী জলও গামলার মেঝেকে 98 নিউটন বল দিয়েছে।

ফলে গামলার মেঝের ওপর চাপের পরিমাণ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{98 \text{ নিউটন}}{0.25 \text{ বর্গমি.}} = 392$ নিউটন/বর্গমি.

একটি কঠিন পদার্থের ব্লক টেবিলের ওপর বল প্রয়োগ করেছে ও তা থেকে আমরা চাপ হিসেব করেছি। তরল পদার্থ জল গামলার তলদেশে বল প্রয়োগ করেছে, ও তা থেকে আমরা চাপ হিসেব করেছি। কিন্তু ভেবে দেখো যে তরল পদার্থ জল গামলাটির শুধু তলদেশেই বলপ্রয়োগ করে না, গামলার দেয়ালেও বল প্রয়োগ করে। যদি গামলার দেয়ালে কোনো ফুটো করা হয়, তাহলে সেখান দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। এটা দেখেই বোঝা যায় যে, তরলের ক্ষেত্রে পাশের দেয়ালেও চাপ হিসেব করা উচিত। এখন আমরা তরলের চাপ নিয়ে আরও কিছু কথা জানার চেষ্টা করব।

নীচের ছবি দুটিতে একটি বড়ো ছড়ানো গামলা ও একটি লম্বা জলের বোতল নেওয়া হয়েছে। গামলাটিতে ওই বোতলের প্রায় পাঁচ বোতল জল ধরে।

এবার গামলা ও বোতল দুটিতেই জল ভরে টেবিলের ধারের দিকে বসানো হলো। গামলা এবং বোতল, দুটির গায়েই নীচের দিকে তলদেশের খুব কাছে একটি করে ফুটো করা হলো।

লক্ষ করলে দেখবে যে বোতলের ফুটো দিয়ে জল যত বেগে বেরিয়ে আসছে ও যত দূরে যাচ্ছে, গামলার ফুটো দিয়ে জল তত বেগে বেরোচ্ছে না ও তত দূরেও যাচ্ছে না। অথচ গামলার জলকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে নীচের দিকে টানে, বোতলের জলকে তার চাইতে কম বল দিয়ে টানে। কারণ বোতলে যদি 1 কেজি জল ধরে, তাহলে গামলায় 5 কেজি জল ধরে। তাহলে প্রশ্ন হলো, বোতলের ফুটো দিয়ে জল বেশি জোরে বেরোচ্ছে কেন? লক্ষ করে দেখো, বোতলে জলের উচ্চতা (H) গামলার জলের উচ্চতার (h) চাইতে বেশি।

তোমরা এরকম আরো কয়েকটি

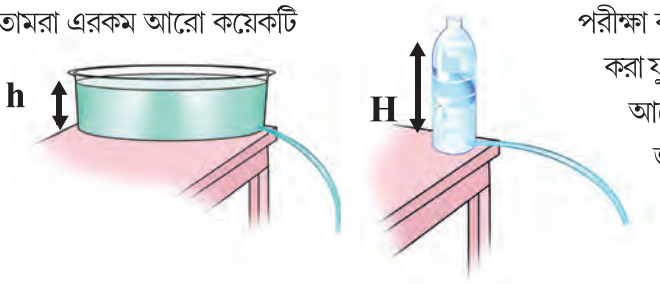

পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে, তলদেশের কাছাকাছি করা ফুটো দিয়ে সেইক্ষেত্রেই জল বেশি বেগে বেরিয়ে আসে যে ক্ষেত্রে পাত্রে জলের উচ্চতা বেশি থাকে। জলের পরিমাণ কম হলেও যদি ফুটো থেকে জলের উপরিতলের উচ্চতা বেশি হয় তাহলে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা জলের বেগও বেশি হয়। (একটি 2 লিটার ও আর একটি তার থেকে ছোট বোতল নিয়েও পরীক্ষাটা করা যায়।)

আরো একটি বিষয় লক্ষ করো। গামলায় জলের ভর যেমন বেশি, তেমনি গামলার মেঝের ক্ষেত্রফলও বোতলের চাইতে অনেক বেশি। খালি গামলার মেঝেতে যদি ওইরকম অনেকগুলো বোতল বসিয়ে রাখতে চাও তাহলে কতগুলো বোতল ধরবে?

অন্তত ছটি বোতল তো ধরবেই। এবার চলো একটা হিসেব করা যাক।

বোতলের জলের ভর =1 কেজি

বোতলের জলের ওজন = (1×9.8) নিউটন = 9.8 নিউটন

বোতলের মেঝের ক্ষেত্রফল ধরা যাক A বর্গমি.

অতএব বোতলের মেঝেতে দেওয়া জলের চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{9.8 \text{ নিউটন}}{\text{A বর্গমি.}}$

$= \frac{9.8}{\text{A}}$ নিউটন/বর্গমি.

এবার, গামলার জলের ভর = 5 কেজি

গামলার জলের ওজন (5×9.8) নিউটন = 49 নিউটন। গামলার মেঝের ক্ষেত্রফল বোতলের মেঝের ক্ষেত্রফলের প্রায় 6 গুণ।

অতএব গামলার মেঝের ক্ষেত্রফল = 6A বর্গমি.

অতএব গামলার মেঝেতে দেওয়া জলের চাপ = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{49 \text{ নিউটন}}{6A \text{ বর্গমি.}} = \frac{\overset{8.166}{\cancel{49}}}{\cancel{6A}}$ নিউটন/বর্গমি.

$= \frac{8.2}{A}$ নিউটন/বর্গমি. (প্রায়)

এখন বলোতো কোন পাত্রের তলদেশে জলের চাপ বেশি — বোতলের, না গামলার?

অতএব, এটা বোঝা গেল যে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা তরলের বেগ চাপের ওপর নির্ভর করে, বলের ওপর নয়। আবার এটাও দেখা গেল যে চাপ সেখানেই বেশি হয় যেখান থেকে তরলের উপরিতলের উচ্চতা বেশি।

আর একটি পরীক্ষা করা যাক।

একটি প্লাস্টিকের তৈরি বোতল নাও। এবার ওই বোতলটির মেঝের খুব কাছে দেয়ালের গায়ে চারদিকেই একটি করে মোট চারটি ফুটো করো। মনে রাখবে, সব কটি পরীক্ষাতেই ফুটোর মাপ যেন সুচ ফুটিয়ে তৈরি করা ফুটোর মতো ছোটো না হয়। মোটা পেরেক গরম করে প্লাস্টিকের গায়ে স্পর্শ করলে যে মাপের ফুটো তৈরি হয়, অন্তত তত বড়ো ফুটো হওয়া চাই। আগের পৃষ্ঠার গামলা ও বোতল নিয়ে করা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এটা জরুরি।

বোতলটিতে জল ভরতি করে দেখো ফুটোগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসা জলের বেগ কীভাবে কমছে। জলের উপরিতল যত নেমে আসছে ফুটোগুলো দিয়ে বেরোনো জলের বেগও তত কমে আসছে। বোতলের এই সবকটি ফুটো থেকেই জলের উপরিতলের উচ্চতা সবসময় একই। ফলে জল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরিতলের উচ্চতা যখন কমে তখনও সবগুলো ফুটোর ক্ষেত্রেই তা একইভাবে কমে। আর তাই ঐ ফুটো দিয়ে বেরোনো জলের বেগও একইভাবে কমে।

এই পরীক্ষাটি থেকে তুমি কী বুঝলে? কোনো স্থানে তরলের চাপ কি শুধু নীচের দিকেই ক্রিয়া করে?

মনে রেখো কোনো স্থানে তরলের চাপ সবদিকে সমানভাবে ক্রিয়া করে।

তরলের চাপ ও ঘনত্ব

একই মাপের ও হুবহু একই রকম দুটি প্লাস্টিকের তৈরি বোতলের দেয়ালে তলদেশের খুব কাছে, তলদেশ থেকে একই উচ্চতায় একটি করে ফুটো করা হলো। দুটি ফুটোতেই আলাদা আলাদা ভাবে বাঁকানো যায় এমন প্লাস্টিকের তৈরি হুবহু একই রকমের দুটি সরু নল লাগিয়ে পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো (চিত্র নং 1a) করে ব্যবস্থাদুটিকে বসানো হলো। সুচহীন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ঐ প্লাস্টিকের নলগুলিতে কেরোসিন তেল ভর্তি করা হলো। এখন বোতল দুটির একটিতে জল আর অন্যটিতে একই আয়তনের গাঢ় নুনজল দিয়ে পূর্ণ করা হলো। এই অবস্থায় নল দুটির লম্বা বাহুগুলির কেরোসিন স্তম্ভের উচ্চতা একটু নজর করলেই দেখবে,

চিত্র নং 1a

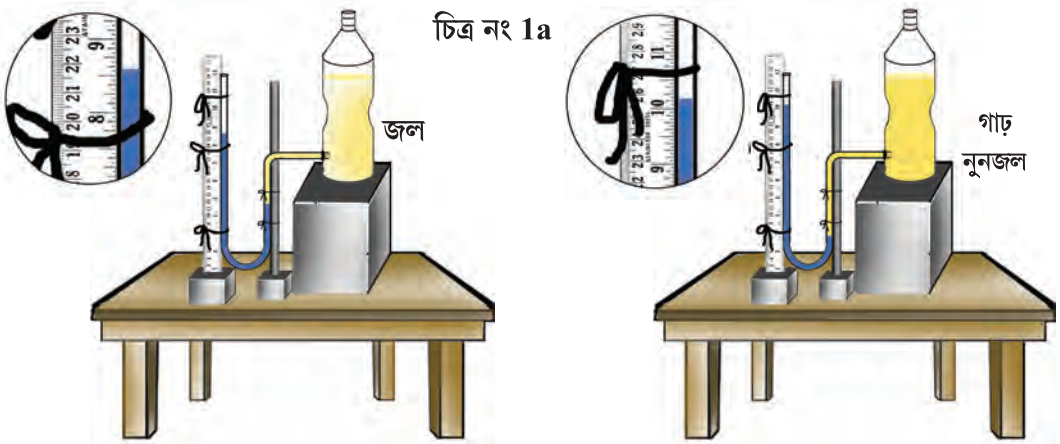

যে বোতলে গাঢ় নুনজল রাখা হয়েছে সেই বোতলের সঙ্গে যুক্ত প্লাস্টিক নলের লম্বা বাহুতে কেরোসিন স্তম্ভের উচ্চতা বেশি হচ্ছে। দুটি বোতলেই ছিদ্র থেকে তরলের উপরিতলের উচ্চতা একই। দুটি তরলের ক্ষেত্রেই ছিদ্রের কাছে তরলের চাপ একই হবার কথা। তাহলে গাঢ় নুনজলের ক্ষেত্রে চাপের মান বেশি কেন? এই সহজ পরীক্ষাটি নিজেরা করো ও উপরের আলোচনার সত্যতা যাচাই করো।

- **তাহলে চাপ-এর পরিমাণ কি তরলের উচ্চতা ছাড়াও আরও অন্য কিছুর ওপরেও নির্ভর করে?**

গাঢ় নুনজলের ঘনত্ব জলের চাইতে বেশি। আবার পরীক্ষা থেকে দেখা গেল, একই উচ্চতা হওয়া সত্ত্বেও গাঢ় নুনজলের ক্ষেত্রে চাপও বেশি। তাহলে তরলের চাপ কি তরলের ঘনত্বের ওপরেও নির্ভর করে?

অতএব এটা বোঝা গেল যে, কোনো তরলের ভেতরে কোনো স্থানে তরলের চাপ কত হবে তা ওই স্থানে তরলের উপরিতলের উচ্চতা, এবং ওই তরলের ঘনত্ব-র ওপর নির্ভর করে।

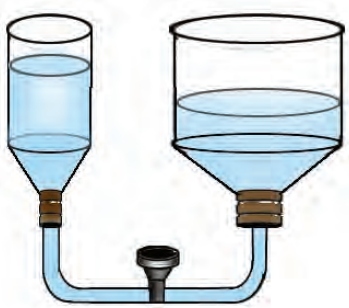

পাশের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ করো। একটি (U) আকৃতির নলের ডানদিকে লাগানো বড়ো পাত্রে তরলের পরিমাণ বেশি, ফলে ভর বেশি, কিন্তু উপরিতলের উচ্চতা কম। বাঁ দিকের ছোটো পাত্রে তরলের পরিমাণ ও তরলের ভর, দুইই কম, কিন্তু তরলের উচ্চতা বেশি।

দুটি পাত্রেই একই তরল নেওয়া হয়েছে এবং সংযোগকারী নলটিতে লাগানো চাবিটি বন্ধ করা আছে। এবার যদি চাবিটি খুলে দেওয়া হয় তাহলে তরল কোন নল থেকে কোন নলের দিকে প্রবাহিত হবে? ষষ্ঠ শ্রেণিতে এইরকম একটি পরীক্ষা তোমরা করেছ। দেখেছ যে তরলের উপরিতলের উচ্চতা দিয়ে ঠিক হয় তরল কোন দিকে প্রবাহিত হবে। তরলের পরিমাণ বা ভর, বা তরলের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলের পরিমাণ — এসবের ওপর তরলের প্রবাহের দিক নির্ভর করে না। অর্থাৎ বল নয়, চাপ দিয়েই ঠিক হয় কোনো তরলের প্রবাহের অভিমুখ।

- **পরের পৃষ্ঠার ছবিগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।**

মাঝখানের চাবিটি খুলে দেবার পর,

(1) নং চিত্রে তরল কোনদিকে প্রবাহিত হবে? A থেকে B-এর দিকে না B থেকে A-এর দিকে?

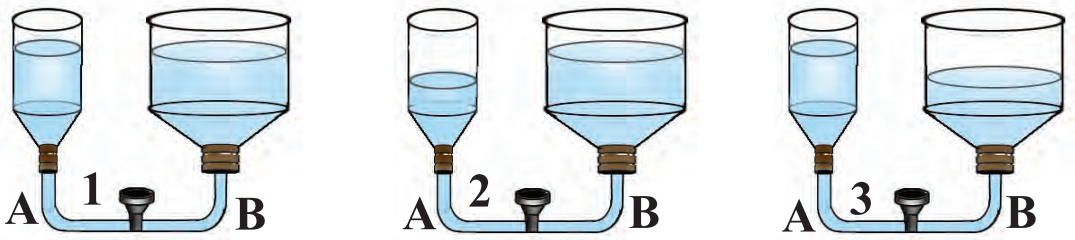

(2) নং চিত্রে তরল কোনদিকে প্রবাহিত হবে? A থেকে B-এর দিকে না উলটোদিকে?

(3) নং চিত্রে তরলের প্রবাহের অভিমুখ কী?

যদি (1), (2) বা (3) নং চিত্রে তরল A থেকে B বা B থেকে A-র দিকে প্রবাহিত হয়, তাহলে সেই প্রবাহ কি চলতেই থাকবে না কি একসময় ওই প্রবাহ নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে?

তরলের প্রবাহ কখন বন্ধ হয়ে যাবে?

(4) নং চিত্রের এক একটি নলে তরলের পরিমাণ এক-একরকম। সেখানে কি তরলের কোনো প্রবাহ হবে? সবকটি নলে তরলের উচ্চতা একই আঁকা হয়েছে। এরকমই কি হবার কথা?

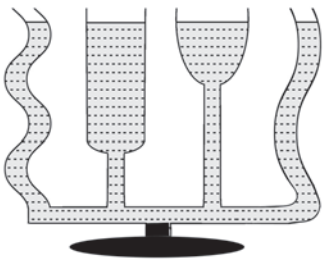

4

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।

বায়ুর চাপ

একটি গামলা নিয়ে তাতে বেশ খানিকটা জল ভরো। এবার, প্রায় তিন-চার ফুট লম্বা একটি রবারের নল নাও। রবারের নলটির দু-মুখ খোলা। নলটিতে পুরো জল ভরো ও তোমার হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দু-দিকের মুখ আটকে রাখো। এবার নলের একদিক গামলার জলে ডুবিয়ে আঙুল সরিয়ে নাও। আর নলের অন্যদিক আঙুল দিয়ে চাপা অবস্থায় উঁচু করে ধরো।

নলের নীচের দিকের মুখ এখন খোলা ও গামলার জলে ডোবানো। কিন্তু তা সত্ত্বেও নলের জল গামলায় পড়ে গেল না কেন?

ছবি দেখে বলো B থেকে A-র দিকে জল প্রবাহিত হলো না কেন? A বিন্দুতে জলের উপরিতলের উচ্চতা, B বিন্দুতে জলের উচ্চতার চাইতে কম, তবু জল B থেকে A-র দিকে যায়নি।

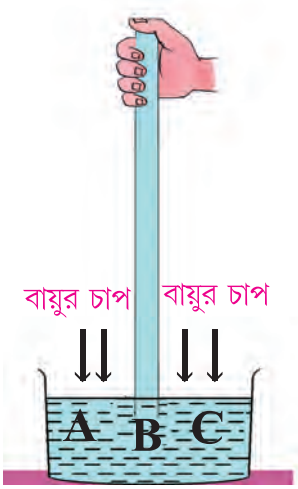

A বিন্দুতে জলের উপরিতলের উচ্চতা কম হওয়া সত্ত্বেও A বিন্দুতে চাপের পরিমাণ B বিন্দুর চাইতে কম হলো না কেন? এর কারণ হলো, বায়ুর চাপ। গামলার জলের উপরিতলের ওপরে রয়েছে বায়ু। তরলের উপরিতলে সেই বায়ুর চাপ ক্রিয়া করবে, ফলে, A বা C বিন্দুতে চাপের পরিমাণ শুধু তরলের চাপ নয়। তরলের ও বায়ুর সম্মিলিত চাপ। কিন্তু B বিন্দুতে চাপের কারণ হলো নলের ভেতরের তরলের উচ্চতা। এবার যদি নলের বন্ধ মুখ থেকে তোমার আঙুল সরিয়ে নাও তাহলে জল নল থেকে গামলায় পড়ে গেল কেন?

এখন নলের ওপরের মুখেও বায়ুর চাপ ক্রিয়া করেছে, ফলে A বা C বিন্দুর চাইতে B বিন্দুতে চাপের পরিমাণ বেশি হয়েছে ও জল B বিন্দু দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এবার ধরা যাক, এই পরীক্ষাটি করার জন্য যে রবারের নলটি নেওয়া হলো তার দৈর্ঘ্য 13 মিটার। রবারের নলটি এবার প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। জলভরতি ওই নলের ওপরের মুখ বন্ধ রেখে নীচের মুখ জলভরতি গামলায় ডোবালে দেখা যাবে যে নল থেকে জল বেরিয়ে গামলায় ততক্ষণই পড়তে থাকল যতক্ষণ না বন্ধ মুখ থেকে জলের তল 1.7 মিটার নেমে আসে। অর্থাৎ **যেই না নলের মধ্যে জলের উচ্চতা গামলার জলের উপরিতল থেকে প্রায় 10. 3 মিটার হলো অমনি জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল।** এ থেকে তোমরা কী বুঝতে পারলে? যখন জলের উচ্চতা 10.3 মিটারের বেশি ছিল তখন জলের চাপ বায়ুর চাপের চাইতে বেশি ছিল। তাই জল নল থেকে বেরিয়ে গামলায় পড়েছে। যেই জলের উচ্চতা প্রায় 10. 3 মিটার হলো তখন জলের চাপ ও বায়ুর চাপ সমান হয়েছে ও নলের জল দাঁড়িয়ে গেছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, 10.3 মিটার উঁচু জল যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে তা বায়ুর চাপের সমান।

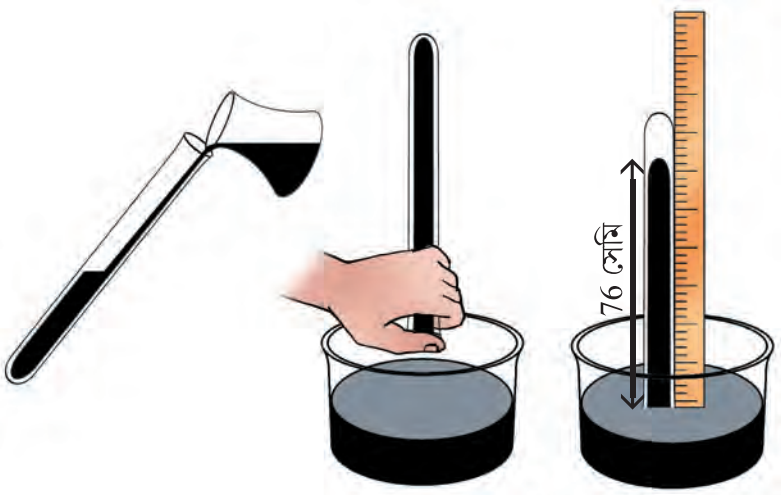

ইতালির পদার্থবিজ্ঞানী টরিচেল্লি এই একই পরীক্ষা করেছিলেন, জলের বদলে পারদ নিয়ে। তিনি দেখেছিলেন যে 76 সেমি উঁচু পারদ যে পরিমাণ চাপ দেয় তা বায়ুর চাপের সমান।

অতএব এই পরীক্ষাগুলো থেকে বোঝা গেল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু যে চাপ দেয় তার পরিমাণ 10.3 মিটার উঁচু জলস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দেয় তার সমান এবং 76 সেমি উঁচু পারদস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দেয় তার সমান।

- **এবার এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করো:**

একই পরিমাণ চাপ তৈরি করতে যেখানে 10.3 মিটার উঁচু জল দরকার সেখানে মাত্র 76 সেমি পারদ সেই চাপ তৈরি করতে পারল কীভাবে?

বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিদিসের নীতি

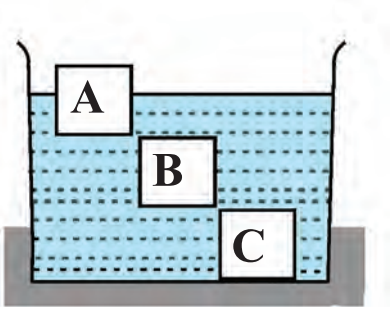

জলের মধ্যে কাঠের টুকরো, থার্মোকলের টুকরো, নৌকো বা জাহাজ ভাসে — এটা তোমরা দেখেছ। আবার একটি লোহার পেরেক জলে ফেললে সেটি ডুবে যায় — তাও দেখেছ। তরলে কোনো বস্তুর ভেসে থাকা বা ডুবে যাওয়া এই নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

পাশের ছবিটি লক্ষ করো। একটি পাত্রে কোনো একটি তরল, ধরা যাক জল নেওয়া হয়েছে। ওই তরলে তিনটি বস্তু A, B ও C দেখানো হয়েছে।

A ও B ভাসছে, কিন্তু C ডুবে গেছে। A বস্তুটিকে পৃথিবী নীচের দিকে টানছে। ধরা যাক A বস্তুটির ওজন 10 নিউটন। তার মানে পৃথিবী A বস্তুটিকে 10 নিউটন বল দিয়ে নীচের দিকে টানছে। A বস্তুটির নীচের দিকে যাবার কথা। কিন্তু সেটি স্থির।

বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ A বস্তুর ওপর উপরের দিকে 10 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে। ফলে A বস্তুর ওপর মোট বল শূন্য হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করল কে? টেবিলের ওপর স্থির থাকা বস্তুর ক্ষেত্রে টেবিল ওই বল প্রয়োগ করে — এটা আমরা দেখেছি। তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু বস্তুটি জলে আছে, ধরেই নেওয়া যায় যে জল ওই ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করেছে।

B বস্তুটিও জলে ভাসছে। ধরা যাক B বস্তুটির ওজন 15 নিউটন। B বস্তুটিকে পৃথিবী 15 নিউটন বল দিয়ে নীচের দিকে টানে। বলোতো B বস্তুর ওপরে জল কি পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করেছে?

যখন কোনো বস্তুকে কোনো তরলে ডোবানো হয় তখন ওই তরল বস্তুটির ওপর একটি ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। এই বলটিকে প্লবতা বলা হয়।

পাশের ছবিগুলো লক্ষ করো। একটি ভারী বস্তুকে একটি স্প্রিং তুলার সাহায্যে ঝোলানো হয়েছে। স্প্রিং তুলার পাঠ দেখে বস্তুটির ওজন জানা যাচ্ছে।

ওই বস্তুটিকে স্প্রিং তুলায় ঝোলানো অবস্থায় একটি তরলে ডোবানো হলো। প্রথমে কিছুটা ডোবানো হলো (চিত্র 2) এবং তারপর পুরোটা ডোবানো হলো। বস্তুটি এমন যে যদি সেটিকে স্প্রিং তুলায় না ঝুলিয়ে তরলে ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে বস্তুটি ডুবে যেত।

চিত্র 1

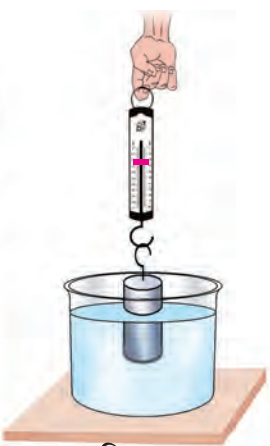
চিত্র 2

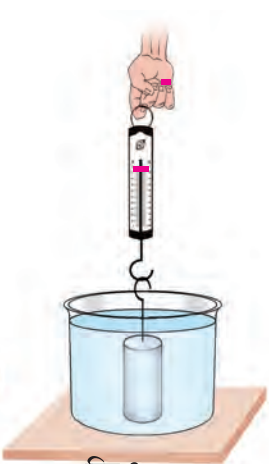
চিত্র 3

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

চিত্র 2 এবং চিত্র 3 দেখলে বোঝা যায় যে তরলে ডোবানোর ফলে স্প্রিং তুলার পাঠ কমে গেছে। এর কারণ কী?

চিত্র 2 -এ স্প্রিং তুলার পাঠ যতটা কমেছে, চিত্র 3-এ ওই পাঠ আরো কমেছে। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? কোনো বস্তুকে তরলে ডোবালে ওই বস্তুটির ওপর তরল যে ঊর্ধ্বমুখী বল (প্লবতা) প্রয়োগ করে তার পরিমাণ কি বস্তুটির কত অংশ তরলে ডুবে আছে তার ওপর নির্ভর করে?

একটি বস্তুকে কোনো তরলে ডোবালে ওই বস্তুটি কিছুটা তরলকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেয় ও নিজে সেই জায়গা দখল করে। বস্তুটিকে জায়গা দিতে গিয়ে যতটা তরল নিজের জায়গা থেকে সরে গেল সেই পরিমাণ তরলের ওজন যত, বস্তুর ওপর তরলের দেওয়া ঊর্ধ্বমুখী বলের (প্লবতা) মানও তত। বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস তাঁর সূত্রে এমন কথাই বলে গেছেন।

একটি বস্তুকে সুতোয় ঝুলিয়ে সেটিকে একটি তরলে তিনভাবে ডোবানো হলো। পাশের চিত্রগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

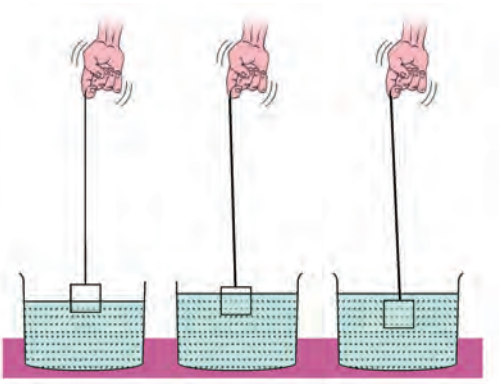

- **পাশের কোন চিত্রের ক্ষেত্রে ডোবানো বস্তুটি বেশি তরলকে অপসারিত করেছে, অর্থাৎ বেশি তরলকে নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে?**
- **কোন চিত্রটির ক্ষেত্রে বস্তুর ওপর তরলের দেওয়া প্লবতার মান বেশি?**

পাশের ছবিদুটি ভালো করে দেখো ও তা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

একই বস্তু D-কে দুটি আলাদা আলাদা তরলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুটি তরলেই বস্তুটি ভাসে। অর্থাৎ বস্তুটির ওপর মোট বলের পরিমাণ দুটি তরলের ক্ষেত্রেই শূন্য।

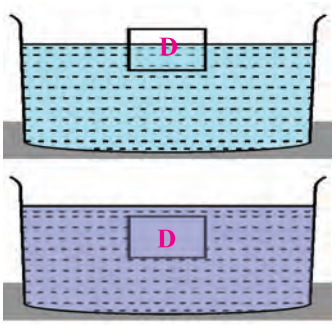

- বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের আয়তন কোন ক্ষেত্রে বেশি?
- বস্তুটির ওপর কোন তরলটি বেশি ঊর্ধ্বমুখী বল (প্লবতা) প্রয়োগ করেছে? না কি দুটি তরলই সমান প্লবতা প্রয়োগ করেছে?
- কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন বেশি?
- কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ভর বেশি?
- তোমরা আগে জেনেছ যে, আয়তন × ঘনত্ব = ভর।
- এবার বলোতো উপরের ছবি দুটির কোন তরলটির ঘনত্ব বেশি?

তাহলে বোঝা গেল যে, **কোনো তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর ওপর ওই তরলটি কত ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে তা নির্ভর করে ওই বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের আয়তন ও ওই তরলটির ঘনত্বের ওপর।**

এবার নীচের প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

একটি ছোটো পেরেকের টুকরো বালতির জলে ফেললে সেটি ডুবে যায়, অথচ, পেরেকের চাইতে অনেক ভারী একটি স্টিলের বাটি বালতির জলে ভাসে। কেন?

তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর ব্যাপারে আমরা যা যা শিখলাম, তা হলো—

কোনো বস্তুকে কোনো তরলে ডোবালে ওই বস্তুটি কিছুটা তরলকে অপসারিত করে। অপসারিত তরলের ওজনের মান, বস্তুর ওপরে তরলের দেওয়া ঊর্ধ্বমুখী বলের মানের সমান।

কোনো বস্তু যখন কোনো তরলে ভাসে তখন বস্তুর ওজনের মান এবং বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের মান সমান হয়।

1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ

- বৃষ্টি কেন আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকেই নেমে আসে? গাছের ঝরাপাতা কেন মাটিতে এসেই পড়ে?
- পৃথিবী কেন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে?
- চাঁদ কেন গাছের পাতার মতো পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে না?

এইসব ঘটনা **অভিকর্ষ তথা মহাকর্ষের** খেলা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, একটা বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর **অভিকর্ষ** বলের টানে নীচের দিকে নামে।

পৃথিবী সব বস্তুকেই **অভিকর্ষ** বল দিয়ে টানে। তাই হাতের ওপর একটা বই রাখলে তুমি তোমার হাতে নীচের দিকে একটা টান অনুভব করো। বই-এর সংখ্যা বাড়লে এই টানের অনুভূতিও বাড়ে।

আগের অধ্যায়ে তোমরা দেখেছ পৃথিবীর এই **মহাকর্ষ টানকে** কাজে লাগিয়ে কীভাবে **স্প্রিং তুলা যন্ত্র** তৈরি করা হয়েছে। যা দিয়ে কোনো বস্তুর **ওজন** মাপা হয়।

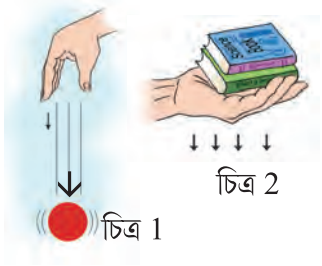

চিত্র 1

চিত্র 2

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা এও জেনেছ শুধু যে পৃথিবীই তার কাছাকাছি সব বস্তুকে আকর্ষণ করে তাই নয়—এ বিশ্বের যে-কোনো দুটি বস্তুকণাই তাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একে অন্যকে সমান মানের বলে আকর্ষণ করে। এই বলের নাম মহাকর্ষ। আসলে অভিকর্ষও একটি মহাকর্ষ বল। পৃথিবী ও পৃথিবীর আশেপাশে থাকা অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে তারই নাম **অভিকর্ষ**।

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন এই মহাকর্ষ **বলের মান** কত হবে তা একটি গাণিতিক সম্পর্ক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। সেটি হলো,

$$F = G \cdot \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

এখানে, F= মহাকর্ষ বল, m_1 ও m_2 বস্তু কণাদুটির ভর, d = বস্তুকণাদুটির মধ্যে সরলরেখা বরাবর দূরত্ব। সরলরেখা যেহেতু সবসময় দুটি বিন্দুর মধ্যেই হয় তাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে দুটি বিন্দু আকৃতির বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের কথাই বলা হয়েছে।

G-কে বলা হয় **'সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক'**। কারণ G-এর মান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গায় একই থাকে, বস্তুদুটির মাঝখানে কী মাধ্যম আছে তার ওপরে নির্ভর করে না।

SI পদ্ধতিতে G-এর একক $\frac{\text{নিউটন} \times \text{মিটার}^2}{\text{কেজি}^2}$ বা $\frac{N \times m^2}{kg^2}$

বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা G-এর মান হিসেব করে দেখা গেছে SI পদ্ধতিতে G-এর মান $= \frac{6.67}{10^{11}} \frac{Nm^2}{kg^2}$

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে ভূগোল পড়তে গিয়ে জেনেছ কোনো বস্তুকে ন্যূনতম 11.2 km/s বেগে পৃথিবীর মাটির ওপর থেকে ওপরের দিকে ছোড়া হলে তা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে যায়।

তোমরা এমন শুনে থাকো যে রকেটে করে পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বাইরে চলে যাওয়া যায়। সত্যিই কি তাই! এসো ব্যাপারটা আসলে কী জানতে চেষ্টা করি।

ধরা যাক, m_1 ও m_2 ভরের দুটি বস্তুকণার মধ্যে দূরত্ব d ও তারা পরস্পরকে F মহাকর্ষ বলে আকর্ষণ করছে।

$$\therefore \quad F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

বস্তুকণাদুটির ভর m_1 ও m_2-র কোনো পরিবর্তন ঘটছে না এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর মানও স্থির। তাহলে Gm_1m_2-র কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে?

এঅবস্থায় যদি বস্তুদুটির মাঝের দূরত্ব d-কে ক্রমশ বাড়ানো হয় তাহলে F-এর মানের কি পরিবর্তন ঘটবে?

ভগ্নাংশটির লব Gm_1m_2 স্থির, হর d যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে $\frac{Gm_1m_2}{d^2}$-এর মান কমবে। অর্থাৎ বস্তুদুটির পারস্পরিক মহাকর্ষ বল, F কমবে।

এভাবে যদি d বাড়তেই থাকে তাহলে F-এর মান কমতেই থাকবে।

তাহলে d-এর এমন কোনো মান কি তুমি পেতে পারো যার জন্য F=0 হবে?

d-এর মান যত বড়োই নাও না কেন F-এর মান কোনো না কোনো একটি সংখ্যাই পাবে যা কখনোই শূন্য হবে না।

অর্থাৎ **যে-কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বহাল থাকে**। যদিও সেই প্রভাব যথেষ্ট ক্ষীণ হতে থাকে। তাই পৃথিবীর থেকে তুমি যত দূরেই যাও না কেন পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাব সেখানেও থাকবেই। বাস্তবে দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে, তা প্রায় অনুভূতির বাইরে চলে যায়। তাই সেই দূরত্বের পর মহাকর্ষীয় প্রভাব প্রায় নেই ধরে নেওয়া হয়।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে দুটি বিন্দুবস্তুর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি কি বিন্দুবস্তু? তাহলে এদের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ সূত্র কীভাবে প্রয়োগ করা হবে?

দুটি বস্তু যত বড়োই হোক না কেন, তাদের মধ্যে দূরত্ব যদি তাদের ব্যাসের তুলনায় অত্যন্ত বেশি হয়, তখন ওই বস্তুদুটিকে বিন্দুবস্তু ধরা যায়।

আবার পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহ সবই প্রায় গোলাকার। গোলক আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে তার জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দুতে ওই বস্তুর সমস্ত ভর জমা আছে ধরে মহাকর্ষ বল হিসেব করা যায়। তাই পৃথিবীর বাইরে যে-কোনো বস্তুকণার ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ বল নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তুকণার দূরত্বকে d-এর মান ধরা হয়।

গাণিতিক সমস্যা ঃ সমান ভরের দুটি বস্তুকণার একটিকে অপরিবর্তিত রেখে অপরটির ভর 3 গুণ করা হলো ও তাদের মধ্যে দূরত্ব পূর্বের 5 গুণ করা হলো। তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল পূর্বের কতগুণ হলো?

ধরা যাক, বস্তুকণাদুটির প্রতিটির ভর ছিল m একক ও তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিলো d একক

$\therefore$ তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল, $F_1 = G\frac{m\times m}{d^2} = G\frac{m^2}{d^2}$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল, $F_2 = G\frac{m\times 3m}{(5d)^2} = G\frac{3m^2}{25d^2} = \frac{3}{25}G\frac{m^2}{d^2} = \frac{3}{25}F_1$

$\therefore$ বস্তুকণাদুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল পূর্বের $\frac{3}{25}$ গুণ হবে।

তোমরা জেনেছ, এই বিশ্বের যে-কোনো দুটি বস্তু পরস্পরকে সরলরেখা বরাবর আকর্ষণ করে। তাহলে তো পৃথিবীর ওপর প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে অন্য সব বস্তুর ঠোকাঠুকি লাগা উচিত। কিন্তু তা তো হয় না। তাহলে কি পৃথিবীর ওপরের বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ সূত্র খাটে না? এসো হিসেব করে দেখি।

ধরা যাক, A ও B দুটি 1 kg ভরের বস্তুকণা পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর পরস্পর থেকে 1 মিটার দূরে রয়েছে। এর ফলে তারা পরস্পরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করছে তার পরিমাণ ধরা যাক F_1 নিউটন।

এখানে, $m_1 = 1$ kg; $m_2 = 1$ kg

$d = 1$ m; $G = \frac{6.67}{10^{11}} \frac{Nm^2}{kg^2}$

$$F_1 = G\frac{m_1 \times m_2}{d^2} = \frac{6.67}{10^{11}} \times \frac{1\times1}{1^2} N = \frac{6.67}{10^{11}} N$$

$$F_1 = 0.0000000000667 \text{ N}$$

অর্থাৎ বস্তুকণা দুটির মধ্যে 6.67 নিউটন-এর দশহাজার কোটি ভাগের এক ভাগ মহাকর্ষ বল কাজ করবে।

এবার এসো পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা একটি 1kg ভরের বিন্দুবস্তুকে পৃথিবী কত পরিমাণ বল দিয়ে আকর্ষণ করছে তা দেখা যাক। ধরা যাক সেই আকর্ষণ বল F_2 নিউটন।

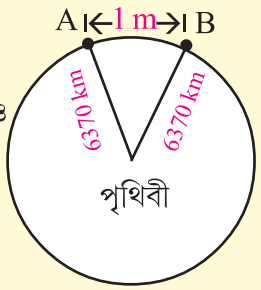

পৃথিবীর ভর = 5.96×10^{24} kg

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6370 km = 6370×10^3m = **পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা** বস্তুকণা ও পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব।

$$F_2 = G \times \frac{\text{বস্তুকণার ভর} \times \text{পৃথিবীর ভর}}{(\text{পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুকণার দূরত্ব})^2}$$

$$= \frac{6.67}{10^{11}} \times \frac{1\times5.96\times10^{24}}{(6370\times10^3)^2} N = 9.797 \text{ N}$$

9.797 নিউটন বল 0.0000000000667 নিউটন বলের চাইতে অনেক অনেক বেশি। $\therefore$ $F_2 >>> F_1$

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা 1 kg ভরের বস্তুকণা দুটিকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে টানে, তার তুলনায় ওই বস্তুদুটোর মধ্যেকার পারস্পরিক আকর্ষণ বল এতটাই নগণ্য যে তার কোনো প্রভাব বাস্তবে বোঝা যায় না।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র প্রয়োগ করে, পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকা একক ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বলের যে রাশিমালা পাই তা হলো,

$$F = G\frac{M\times1}{R^2}$$ M= পৃথিবীর ভর

$$\therefore F = \frac{GM}{R^2}$$ R= পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

একক ভরের ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষের টানকে ‘g’ দিয়ে চিহ্নিত করা যাক

$$\therefore g = \frac{GM}{R^2}$$

ফলে m - ভরের বস্তুর ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের মানকে অর্থাৎ m ভরের বস্তুর ওজন (Weight) কে যদি W বলা হয়, তাহলে লেখা যায়

$$W = \frac{GMm}{R^2}$$

বা, $$W = \left(\frac{GM}{R^2}\right)\times m$$

$$\therefore W = gm$$

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভাবে গতি

একটা খেলার বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দাও। বলটি অভিকর্ষের টানে নীচের দিকে পড়তে থাকবে। বলটি ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেটির বেগ কত ছিল? কিন্তু তার পরের মুহূর্তে বলটির বেগ কি আর শূন্য ছিল? তাহলে বলটির বেগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। অর্থাৎ বলটিতে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্বরণের জন্যে কোন বল দায়ী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ।

অভিকর্ষ বলের প্রভাবে অবাধে পতনশীল কোনো বস্তুতে যে ত্বরণের সৃষ্টি হয় তাকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়। নিউটনের গতি সূত্র অনুযায়ী, বল = ভর × ত্বরণ $(F= m\times a)$। তাহলে কোনো বস্তুর ওপর অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে কত ত্বরণ হওয়া উচিত?

$F= m\times a$ এখানে F হলো m-ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বল, যার মান $\frac{GmM}{R^2}$

$\therefore \frac{GmM}{R^2} = m\times a$ বা, $a = \frac{GM}{R^2} = g$ [তাহলে দেখা যাচ্ছে g, বস্তুর ভর (m) নিরপেক্ষ। অর্থাৎ যেকোনো ভরের বস্তুর ক্ষেত্রেই g এর মান একই হবে।]

অতএব দেখা গেল যে একক ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বলের মান ও অভিকষর্জ ত্বরণের মান সমান।

SI পদ্ধতিতে g -এর গড় মান = $9.8 m / s^2$

$g = \frac{GM}{R^2}$ এই সূত্রটিতে যেহেতু GM ধ্রুবক, অতএব g এর মান নিশ্চয়ই 'R' এর ওপর নির্ভরশীল।

পৃথিবী সব স্থানে R এর মান কি সমান? তাহলে পৃথিবীর সব স্থানে g এর মান কি সমান? পৃথিবীর সবস্থানেই কি বস্তুর ওজন (mg) সমান?

হিসাব করে দেখা গেছে চাঁদের গড় অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর গড় অভিকর্ষজ ত্বরণের $\frac{1}{6}$ গুণ।

1 kg ভরের কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে আকর্ষণ করে তার মান = 9.8 N। কোনো বস্তুর ভর 3 kg হলে, তার ওজন = 3×9.8 N। তাহলে ভেবে বলতো ওই বস্তুর ওজন চাঁদের পৃষ্ঠে কত হবে?

একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো আর একটা পাথরের টুকরোকে একসঙ্গে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দাও।

কী দেখতে পেলে? পাথরের টুকরো ভারী বলেই কি তা কাগজের টুকরোর আগে মাটিতে এসে পড়ল?

গ্রিসের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল কিন্তু এমন ধারণাই পোষণ করতেন যে হালকা বস্তুর তুলনায় ভারী বস্তু আগে মাটি স্পর্শ করে। পরবর্তীকালে ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই (1564-1642) প্রমাণ করে দেখান হালকা বা ভারী সব বস্তুকেই একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হলে তারা একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করবে।

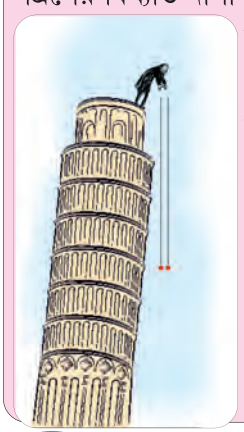

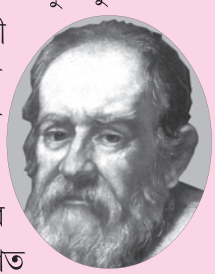

শোনা যায়, গ্যালিলিও একই আয়তনের একটি নিরেট লোহার গোলক ও একটি কাঠের গোলককে ইতালির পিসা শহরের বিখ্যাত হেলানো মিনারের শীর্ষ থেকে একসঙ্গে ছেড়ে দেন। সবাই অবাক হয়ে দেখেন তুলনায় ওজনে অনেক ভারী লোহার গোলক ও হালকা কাঠের গোলক প্রায় একসঙ্গে নামতে থাকে এবং প্রায় একসঙ্গে এসে মাটি স্পর্শ করে।

চলো একটা পরীক্ষা করা যাক।

এক টাকার একটা কয়েন নাও। কয়েনটার চাইতে ছোটো একটা কাগজের টুকরো কেটে নাও। কাগজের টুকরোর মাপ যেন কোনোভাবে কয়েনের চেয়ে বড়ো না হয়।

এবার কয়েন ও কাগজের টুকরোকে আলাদাভাবে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দাও। কী দেখলে?—

কয়েনটা আগে পড়ল আর কাগজের টুকরোটা পরে।

এবার কয়েনটার ওপর কাগজের টুকরোটা ভালোভাবে বসাও ও কাগজের টুকরোসহ কয়েনটা ছবির মতো করে ওপর থেকে ছেড়ে দাও।

এবার কী দেখতে পেলে? কাগজের টুকরোর চেয়ে কয়েন তো অনেক বেশি ভারী, তাহলে তারা একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করল কেন?

প্রথমে, আলাদাভাবে ফেলার সময় কয়েন যেভাবে বায়ুর বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল, কাগজের টুকরো তা পারেনি। একসঙ্গে ফেলার সময় যেহেতু কয়েন ও কাগজের টুকরো একসঙ্গে বায়ুর বাধা অতিক্রম করেছে, তাই এক্ষেত্রে কয়েন ও কাগজ একসঙ্গে পড়েছে।

এবার ভেবে বলো, বায়ুর বাধা না থাকলে কয়েন ও কাগজকে যদি আলাদাভাবে ফেলা হতো তাহলে তারা কি একইসময় পড়ত না কয়েন আগে পড়ত?

পৃথিবীর টানে কোনো বস্তু পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকলে তাকে পতনশীল বস্তু বলে।

স্থির অবস্থা থেকে বাধাহীনভাবে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিও তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন। সূত্রগুলোর মর্মার্থ হলো—

(i) একই উচ্চতা ও স্থির অবস্থা থেকে **অবাধে** পতনশীল সব বস্তুই সমান দ্রুততায় নীচে নামে।

(ii) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর বেগও বাড়তে থাকে।

(iii) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বও বাড়ে।

পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে একটা পাথরের টুকরোকে সোজা ওপরের দিকে ছুড়ে দাও। পাথরটি যত ওপরে ওঠে সেটির গতি কমতে থাকে কেন?

কমতে কমতে সেই গতির দিক উলটে গিয়ে পাথরটি আবার তোমার হাতে ফিরে আসে কেন?

নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছ যে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানই এর কারণ।

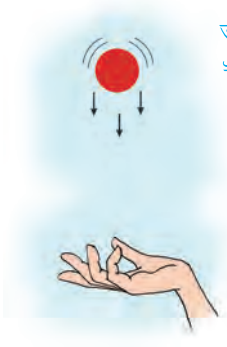

অভিকর্ষের টানের দিকে ত্বরণ হয়। ফলে ঊর্ধ্বমুখী বেগ কমে ও এক সময় অভিকর্ষের টানের দিকে তা বাড়তে থাকে। তাই পাথরটি ফিরে আসে।

এবার ভূমির সঙ্গে কোনাকুনিভাবে একটি পাথরের টুকরোকে ছোড়ো। পাথরটির গতিপথ লক্ষ করো।

এই গতিপথ এরকম হলো কেন?

এক্ষেত্রেও অভিকর্ষের টান ভূমির দিকে। পাথরের বেগের দিক ও ত্বরণের দিক ছবিতে লক্ষ করো।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বেগের দিক বদলাতে বদলাতে আবার ভূমির দিকেই ঘুরে যাওয়ার জন্য যা দায়ী তা হলো অভিকর্ষের টান। অভিকর্ষের টানে এ জাতীয় চলন্ত বস্তুর বেগ পালটায় ও বস্তুটি ছবির মতো বাঁকা পথে ভূমিতে ফিরে আসে।

কোনাকুনি ছোড়ার সময় পাথরটিকে যদি আরও জোরে ছোড়া হতো তাহলে সেটি কীরকম পথে ফিরে আসত তা নীচের ছবিতে দেখলেই বোঝা যাবে।

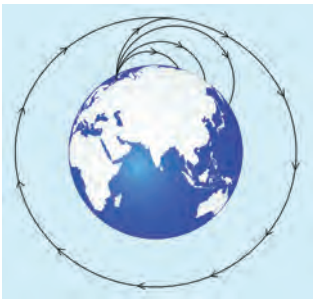

এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে জোরে ছুড়তে ছুড়তে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন পাথরটি পৃথিবীতে ফিরে আসার বদলে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে। এই ঘোরার সময়ও কিন্তু পাথরটির বেগ অভিকর্ষের টানের দিকেই বদলাচ্ছে। কিন্তু যাত্রাপথটি বৃত্তাকার হয়েছে।

পৃথিবী থেকে আকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহকে এভাবেই ছোড়ার ফলে তা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

স্থির তড়িৎ বল ও আধানের ধারণা

আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যেসব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞানের কত না রহস্য। প্রতিদিনের এইসব ঘটনাই জন্ম দেয় হাজারো প্রশ্নের, আর এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন প্রকৃতির অজানা সব নিয়ম-কানুন, তৈরি হয় বিজ্ঞানের নানান সূত্র বা নীতি। আমাদের দেখা এমন কয়েকটি খুব সাধারণ ঘটনা থেকে বিজ্ঞানের কোন নিয়মের কথা জানা যায়, তা আমরা এখন খোঁজার চেষ্টা করব।

একটি ধাতব ছুরি বা ব্লেড থার্মোকলের টুকরোকে সাধারণ অবস্থায় আকর্ষণ করে না। কিন্তু ওই ধাতব ছুরি বা ব্লেড দিয়ে থার্মোকল কাটার সময়, থার্মোকলের ছোটো টুকরোগুলো ছুরি বা ব্লেডের গায়ে আটকে যায়। জোরে ঝাঁকুনি দিলেও সহজে তা ছাড়ানোযায় না। যদিও ঘটনাটি ক্ষণস্থায়ী।

শীতকালে শুকনো চুল আঁচড়ানোর পর, সঙ্গে সঙ্গে চিরুনিটিকে কয়েকটি কাগজের টুকরোর খুব কাছে আনলে, কাগজের টুকরোগুলো চিরুনির গায়ে আটকে যায়। যদিও কিছুক্ষণ পর চিরুনি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। অথচ চুল আঁচড়ানোর আগে ওই চিরুনিটি কাগজের টুকরোগুলোকে মোটেই আকর্ষণ করে না।

শীতকালে একটি ফোলানো বেলুনকে তোমার পরা সোয়েটারের গায়ে ভালো করে ঘষে ছেড়ে দিলে দেখা যায় সেটি সোয়েটারের গায়ে আটকে আছে, পড়ে যাচ্ছে না। অথচ ওই বেলুনটিকে সোয়েটারে না ঘষে শুধু স্পর্শ করে রাখলে সেটি তোমার সোয়েটারে আটকে থাকে না। পড়ে যায়।

চিত্র :1

চিত্র :2

ওপরের প্রতিটি ঘটনা ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবে ছুরি বা ব্লেড, প্লাস্টিকের চিরুনি, ফোলানো বেলুন, প্রত্যেকটি জিনিসেরই অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে ঘর্ষণ হয়েছে। আর ঘর্ষণের পর প্রতিটি বস্তুতেই আকর্ষণ করার ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু ঘর্ষণ না হলে তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ ক্ষমতার সৃষ্টি হয় না।

তাহলে কি ঘর্ষণ ও আকর্ষণ ক্ষমতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

ঘর্ষণের ফলে ওই জিনিসগুলোর মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে ওই বস্তুগুলো অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুর মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটলে বলা হয় ওই বস্তুতে **তড়িৎ আধানের সৃষ্টি হয়েছে**।

ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুতে সৃষ্টি হওয়া এই ধরনের তড়িৎকে বলে **ঘর্ষণজাত তড়িৎ বা আধান** (Charge)। ঘর্ষণের ফলে বস্তুতে তৈরি হওয়া ওই অবস্থাকে বলে **তড়িতাহিত অবস্থা**।

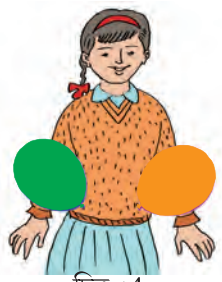
চিত্র :4

চলো কয়েকটি পরীক্ষা করে এই **তড়িৎ আধান** সম্পর্কে আরো কিছু জানার চেষ্টা করি।

দুটি ফোলানো বেলুন পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরে রাখলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই দেখা যায় না (চিত্র : 3)। এবার ওই ফোলানো বেলুন দুটি নিয়ে সোয়েটারে ভালোভাবে ঘষো (চিত্র : 4)। বেলুন দুটিকে এবার সুতোর সাহায্যে পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরো (চিত্র : 5)।

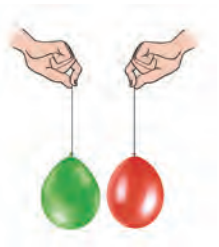
চিত্র ঃ3

কী দেখতে পেলে? বেলুনদুটো পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল। অর্থাৎ বেলুনদুটি পরস্পরকে **বিকর্ষণ** করল।

অথচ ওই বেলুনদুটোকে সোয়েটারে ভালোভাবে ঘষে ছেড়ে দিলে তারা সোয়েটারের গায়ে আটকে থাকে। অর্থাৎ ঘর্ষণের পর সোয়েটার আর বেলুনের মধ্যে **আকর্ষণ বল** সৃষ্টি হয়।

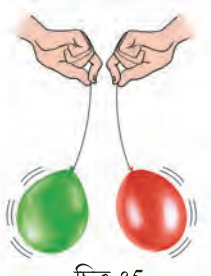
চিত্র ঃ5

বেলুনদুটোকে একই বস্তু (উলের সোয়েটার) দিয়ে ঘষা হয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই দুটি বেলুনেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বেলুনদুটিতে সৃষ্টি হওয়া তড়িৎ আধান নিশ্চয়ই একই জাতের। তাহলে কি একই ধরনের তড়িতাহিত দুটি বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে?

আবার, বেলুন আর উলের সোয়েটার পরস্পর ঘষলে তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করেছে।

তাহলে কি বেলুন ও সোয়েটারে উৎপন্ন তড়িৎ আধানের প্রকৃতি এক নয়?

সোয়েটার আর বেলুনের তড়িতাহিত অবস্থা দুটি কি আলাদা?

তাহলে বলা যায় —

(i) একই জাতের তড়িৎ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

(ii) ভিন্ন জাতের তড়িৎ আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

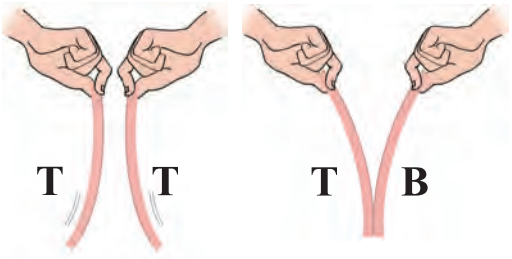

10 cm মাপের ছয় টুকরো চওড়া সেলোটেপ নাও। প্রতিটির এক প্রান্তে আঠার দিকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ লাগিয়ে রাখো যাতে ওই প্রান্তে সেলোটেপগুলোকে ধরলে হাতে আঠা না লাগে। ওই কাগজ লাগানো প্রান্তটি যেন সেলোটেপটিকে ধরার হাতল। এবার একটা টেবিলের তল বা আয়নার ওপর তিনটি সেলোটেপকে আটকে দাও ও তাদের গায়ে 'B' লেখো। অন্য তিনটি সেলোটেপকে 'B' লেখা সেলোটেপ তিনটির ওপর এমনভাবে লম্বালম্বি আটকে দাও যাতে ওপরের টেপটির জন্য নীচের টেপটি ঢেকে যায়। এবার উপরে সাঁটা টেপ তিনটির গায়ে 'T' লেখো।

এখন দুটি 'T' লেখা টেপকে তাদের কাগজ সাঁটা প্রান্তদুটি দু-হাতে ধরে দ্রুত টান মেরে তুলে নাও। তারপর হাত থেকে ঝুলতে থাকা ওই দুটি টেপের আঠার উলটোদিক পরস্পরের কাছাকাছি আনো। কী দেখতে পেলে? 'T' লেখা টুকরোদুটো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল অর্থাৎ তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করল।

এবার একই রকম করে 'B' লেখা টুকরোদুটোকে দ্রুত তুলে, আঠার উলটো পিঠ দুটি কাছাকাছি আনো। এবার কী দেখলে? এবারও টুকরোদুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।

এখন, বাকি সেলোটেপ দুটো একসঙ্গে দ্রুত তুলে নিয়ে পরস্পর থেকে ছাড়িয়ে নাও ও একইভাবে তাদের আঠার উলটোদিক পরস্পরের কাছে আনো। এবার কী দেখলে? এবার টুকরোদুটো (T ও B) পরস্পরকে আকর্ষণ করল।

এখন নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

'T' লেখা সেলোটেপ দুটিতে যে ধরনের তড়িৎ আধানের সৃষ্টি হয়েছে তা একই জাতের না আলাদা জাতের?

'B' লেখা সেলোটেপ দুটিতে তৈরি হওয়া তড়িত আধান কি একই জাতের না আলাদা জাতের?

'T' লেখা সেলোটেপে উৎপন্ন তড়িৎ আধান ও 'B' লেখা সেলোটেপে উৎপন্ন তড়িৎ আধান কি একই জাতের না আলাদা জাতের?

দুটি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে বস্তুদুটিতে যে তড়িৎ আধানের সৃষ্টি হয় তা কি একই জাতের না ভিন্ন জাতের?

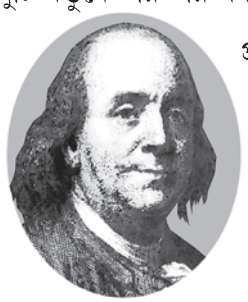
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী **বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা থেকে তড়িতের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও তিনি এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।** এই দুই জাতীয় তড়িৎ আধানের নামকরণ করা হয় ধনাত্মক তড়িৎ ও ঋণাত্মক তড়িৎ। এদের যথাক্রমে বীজগণিতের '+' ও '–' চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

তাহলে কোনো একটি বস্তুকে অন্য কোনো বস্তু দিয়ে ঘষা হলে কোন বস্তুর আধানকে ধনাত্মক (+) ও কোন বস্তুর আধানকে ঋণাত্মক (–) নাম দেওয়া হবে তা ঠিক হবে কীভাবে?

পাশের পৃষ্ঠার তালিকাটি লক্ষ করো। তালিকায় অবস্থিত যে-কোনো দুটি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে সেই বস্তুর আধানকে ধনাত্মক (+) বলা হবে যার নাম তালিকার উপরে আছে। আর সেই বস্তুর আধানকে ঋণাত্মক (–) বলা হবে যার নাম তালিকার নীচে আছে।

যেমন— কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘষলে, কাচে ধনাত্মক (+) ও সিল্কে ঋণাত্মক আধান (–) আহিত হবে, কারণ তালিকায় কাচ সিল্কের উপরে আছে।

1) পশম বা উল
2) কাচ
3) কাগজ
4) রেশম বা সিল্ক
5) কাঠ
6) মানুষের দেহ
7) ধাতব পদার্থ
8) এবোনাইট
9) গালা
10) অ্যামবার
11) রজন
12) সেলুলয়েড

● উলের মাফলার দিয়ে একটি কাচের দণ্ডকে ঘষা হলো, আর সিল্কের রুমাল দিয়ে একটি এবোনাইট দণ্ড ঘষা হলো। এবার মাফলার ও এবোনাইট দণ্ডকে কাছাকাছি আনা হলো। কী ঘটবে বলো দেখি আকর্ষণ না বিকর্ষণ? যদি কাচের দণ্ডটিকে এবোনাইট দণ্ডের কাছে আনা হতো তবেই বা কী হতো? মাফলার আর সিল্কের টুকরোকে কাছাকাছি আনলেই বা কী হতো?

কুলম্ব -এর সূত্র :

দুটি বস্তুর আধানের প্রকৃতি কী হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে তা তোমরা দেখেছ। কিন্তু তড়িৎ আধান যুক্ত বস্তুদুটির মধ্যে ওই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কত জোরালো হবে তা জানার উপায় কী? ওই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের হিসেব কীভাবে করা হয়?

তড়িতাহিত দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎবল-এর হিসেব করার জন্য ফরাসি বিজ্ঞানী **চার্লস অগস্টিন দ্য কুলম্ব** একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সূত্রটি নীচে লেখা হলো—

$$F = K\frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

এখানে q_1 এবং q_2 হলো তড়িতাহিত বস্তুদুটির আধানের পরিমাণ, r হলো তড়িতাহিত বস্তুদুটির মধ্যের দূরত্ব, এবং F হলো বস্তু দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ বল (তা, আকর্ষণই হোক বা বিকর্ষণই হোক) -এর মান। তড়িতাহিত বস্তু দুটির মধ্যের অঞ্চলে কী পদার্থ আছে তার ওপর 'K'-র মান নির্ভর করে। যেমন, তড়িতাহিত বস্তু দুটিকে যদি বায়ুতে রাখা হয় অর্থাৎ বস্তুদুটির মধ্যের অঞ্চলে যদি বায়ু থাকে তাহলে K-র মান যা হবে, জল থাকলে তা হবে না।

তোমরা জানো যে সরলরেখা এঁকে দুটি বস্তুর মধ্যের দূরত্ব তখনই সঠিকভাবে মাপা সম্ভব, যখন বস্তু দুটি বিন্দু-আকৃতির। কুলম্ব-এর এই সূত্রে তড়িতাহিত বস্তুদুটিকে বিন্দু আকৃতির বস্তু হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

তোমরা জানো যে বল মাপার একটি একক হলো **ডাইন**। 1 গ্রাম ভরের বস্তুতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বস্তুটিতে 1 সেমি/সেকেন্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হয়, সেই পরিমাণ বলকে **1 ডাইন** বল বলা হয়। দূরত্ব মাপার একক সেন্টিমিটার বা সেমি — এটাও তোমরা জানো। কিন্তু তড়িৎ আধান q_1 বা q_2 মাপা হয় কীভাবে? এব্যাপারে আমরা এখন একটি উপায় শিখব।

যদি একই পরিমাণ আধান যুক্ত দুটি বিন্দু আকৃতির বস্তুকে শূন্যস্থানে পরস্পর থেকে 1 সেমি দূরত্বে রাখা হয় তবে বস্তুদুটির মধ্যে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে। যদি এই বিকর্ষণ বলের মান 1 ডাইন হয় তাহলে বলা হয় যে বস্তুদুটির প্রতিটির আধানের পরিমাণ **1 ই.এস.ইউ (esu) বা 1 স্ট্যাটকুলম্ব** । **1 ই.এস.ইউ বা 1 স্ট্যাটকুলম্ব** হলো আধান মাপার একক। তড়িৎ আধান পরিমাপের এই উপায়কে আমরা **'গাউস'-এর উপায়** বলে জানি।

এই উপায়টিতে শূন্যস্থানের জন্য K-এর মান 1 ধরা হয়। গাউস একজন বিজ্ঞানী, যিনি তড়িৎ সংক্রান্ত বিজ্ঞানে অনেক অবদান রেখেছেন।

আধান মাপার অন্য একটি উপায়ও আছে। সেটিকে বলে SI উপায়। এই উপায়টিতে বল মাপার একক 1 নিউটন, দূরত্ব মাপার একক 1 মিটার, এবং আধান মাপার একক 1 কুলম্ব। এই ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমের

জন্য K-এর মান 1ধরা যায় না।

শূন্য মাধ্যমের জন্য K-এর মান ধরতে হয় $9 \times 10^9 \frac{\text{নিউটন} \times (\text{মিটার})^2}{\text{কুলম্ব}^2}$

এবার সূত্রটিকে ভালো করে খেয়াল করো।

সূত্রটির ডানপক্ষের লব হলো Kq_1q_2 ও হর হলো r^2। ধরা যাক বস্তুদুটি একই আছে ও একই স্থানে রাখা আছে। ফলে Kq_1q_2 -র মান বদলাচ্ছে না। এবার যদি বস্তুদুটির মধ্যের দূরত্ব কমে, অর্থাৎ ভগ্নাংশটির হর r^2 ছোটো হতে থাকে, তাহলে ভাগফলের মান (F) বাড়বে না কমবে?

আবার, Kq_1q_2 একই রেখে r^2-এর মান যদি বাড়ে, সেক্ষেত্রে ভাগফল F-এর মানের কি পরিবর্তন হবে? তাহলে দেখা গেল একই মাধ্যমে অবস্থিত দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে দূরত্ব বাড়লে আধান দুটির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান কমে। আবার সেই দূরত্ব কমলে ওই বলের মান বাড়ে।

ঘর্ষণের ফলে বস্তুতে আধানের উদ্ভব ঘটে কেন? সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা পড়েছ যে—

- সমস্ত পদার্থ পরমাণু দিয়ে তৈরি।
- একটি পরমাণু তৈরি হয় তিনরকমের কণা দিয়ে — **ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন**। (একমাত্র ব্যতিক্রম সাধারণ হাইড্রোজেন যার পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই)
- ইলেকট্রন ঋণাত্মক (–) আধান যুক্ত কণা, প্রোটন ধনাত্মক (+) আধান যুক্ত কণা, আর নিউট্রনের কোনো তড়িৎ আধান নেই, অর্থাৎ নিউট্রন নিস্তড়িৎ।
- একটি পরমাণুতে প্রোটনগুলোর মোট ধনাত্মক (+) আধানের পরিমাণ ওই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর মোট ঋণাত্মক (–) আধানের পরিমাণের সমান। ফলে একটি পরমাণুর মোট আধানের মান শূন্য ও পরমাণুটি নিস্তড়িৎ।

এবার ভেবে বলোতো, আমাদের চারপাশের সব বস্তুগুলো সাধারণভাবে আধানহীন বা নিস্তড়িৎ হয় কেন? সব বস্তুই যেহেতু পরমাণু দিয়ে তৈরি, আর পরমাণুগুলো যেহেতু নিস্তড়িৎ, তাই বস্তুগুলোও নিস্তড়িৎ।

এখন প্রশ্ন হলো, ওই নিস্তড়িৎ বস্তুগুলো ঘর্ষণের পর তড়িৎ আধান পায় কীভাবে?

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা এটা জেনেছ যে পরমাণুর কেন্দ্রে একত্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রনগুলো। ওই দলা পাকানো কেন্দ্রটির নাম **নিউক্লিয়াস**। নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন বা নিউট্রনকে আলাদা করা খুব কঠিন। ইলেকট্রনগুলো ওই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে পাক খায়। সূর্যকে ঘিরে গ্রহদের পাক খাওয়ার মতো। পরমাণু থেকে প্রোটনকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ইলেকট্রনকে তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া যেমন শক্ত নয় তেমনি পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত করাও কঠিন

নয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণুগুলো এরকম ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া করে। ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু জোটকে বলে অ্যানায়ন। ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু জোটকে বলে ক্যাটায়ন।

এবার নীচের সারণিটি পূরণ করো।

পরমাণুতে যা ঘটল	ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়বে/ কমবে/ একই থাকবে	ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটনসংখ্যা কম হবে/ বেশি হবে/ একই থাকবে	ইলেকট্রনের মোট তড়িতাধানের তুলনায় প্রোটনের মোট তড়িতাধান কমে গেল/ বেড়ে গেল	পরমাণুটির আধানের প্রকৃতি ধনাত্মক/ ঋণাত্মক
নিস্তড়িৎ পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণ				
নিস্তড়িৎ পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়া				

তাহলে বলা যায়

পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে পরমাণুটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়।

পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পরমাণুটি ধনাত্মক আধানে আহিত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তু পরস্পর ঘষলে তাদের মধ্যে একটি ধনাত্মক ও অপরটি ঋণাত্মক তড়িতাহিত হয়ে পড়ে কেন?

তাহলে কি এখানে 'ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া ও বেরিয়ে যাওয়ার' ব্যাপারটি ঘটে?

আসলে, দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে একটি বস্তু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে ফলে সেই বস্তুতে ইলেকট্রনের সংখ্যার তুলনায় প্রোটন সংখ্যা বেশি হয়ে পড়ে। ফলে বস্তুটি ধনাত্মক আধানে আহিত হয়।

কিন্তু ওই ইলেকট্রনগুলি যায় কোথায়?

যেহেতু অন্য পদার্থটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ওই ইলেকট্রনগুলি দ্বিতীয় বস্তুর পরমাণুতে যুক্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তখন ওই পদার্থের ইলেকট্রন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।

তাহলে দেখা গেল একটি পদার্থ যতগুলো ইলেকট্রন হারায় অন্য পদার্থটি ঠিক ততগুলোই ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাই একই সঙ্গে ওই দুই বস্তুতে সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির তড়িৎ আধান উৎপন্ন হয়।

এবার একটি অন্য ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক।

প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে শীতকালে শুকনো মাথার চুল আঁচড়ানোর পর তা নিস্তড়িৎ কাগজ টুকরোকে আকর্ষণ করে। এর কারণ কী? চুলের সঙ্গে ঘর্ষণে চিরুনি তড়িতাহিত হলেও কাগজের টুকরোকে তো কোনো কিছুর সঙ্গে ঘষা হয়নি।

তোমরা জানো যে বিপরীত তড়িতাধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও সমতড়িতাধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তাহলে কি নিস্তড়িৎ কোনো বস্তুর কাছে একটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তু আনলে, নিস্তড়িৎ বস্তুতে বিপরীত আধান তৈরি হয়? তা না হলে আকর্ষণ কীভাবে সম্ভব?

ধরা যাক, ধনাত্মক তড়িতাধানে আহিত কোনো একটি বস্তুকে, কোনো নিস্তড়িৎ বস্তুর কাছে আনা হলো।

একটি বস্তু নিস্তড়িৎ হবার কারণ হলো এই যে, সেই বস্তুতে সমান পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান থাকে।

এবার যখন একটি ধনাত্মক আধান যুক্ত বস্তুকে নিস্তড়িৎ বস্তুর কাছাকাছি আনা হয় তখন ওই নিস্তড়িৎ বস্তুর ভেতরকার ঋণাত্মক আধানগুলো ধনাত্মক বস্তুটির জন্য আকর্ষণ অনুভব করে ও ধনাত্মক বস্তুটির দিকে সরে যায়।

ফলে ধনাত্মক বস্তুটির উপস্থিতির কারণে নিস্তড়িৎ বস্তুটির একপ্রান্ত ঋণাত্মক ও অন্যপ্রান্ত ধনাত্মক তড়িতাহিত বস্তুর মতো আচরণ করে, এবং ধনাত্মক বস্তুটি নিস্তড়িৎ বস্তুর ঋণাত্মক প্রান্তটিকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয়।

কোনো তড়িতাহিত বস্তুর উপস্থিতির কারণে একটি নিস্তড়িৎ বস্তুর দুই প্রান্তে বিপরীত তড়িৎ-এর সমাবেশ ঘটার এই ঘটনাকে বলে **তড়িৎ আবেশ**। এই কারণেই তড়িতাহিত চিরুনি নিস্তড়িৎ কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। আবেশ সৃষ্টিকারী বস্তুটিকে সরিয়ে নিলে সাময়িকভাবে আবিষ্ট হওয়া বস্তুটি পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

তড়িৎ বলের প্রভাবে গতি

তোমরা দেখলে যে বিপরীতধর্মী তড়িৎ আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও সমধর্মী তড়িৎ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই প্রকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ — দুটিই হলো 'বল'। এই বলের নাম তড়িৎ বল বা **স্থিরতড়িৎ বল**।

নিউটনের সূত্র থেকে তোমরা জেনেছ যে বলের প্রভাবে বেগ বদলে যায়, ফলে ত্বরণ সৃষ্টি হয়। বল যে দিকে ক্রিয়া করে বেগ সেই দিকেই বদলায়, অর্থাৎ বলের দিকেই ত্বরণ হয়।

তড়িৎ আকর্ষণ বলের প্রভাবে হওয়া গতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতি। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা নিউক্লিয়াস ধনাত্মক তড়িৎ যুক্ত, কারণ সেখানে প্রোটন ছাড়া আর কোনো তড়িৎযুক্ত কণা নেই। আর ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা। ফলে নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে তড়িৎ আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। তাই চলন্ত ইলেকট্রনের বেগের অভিমুখ ক্রমাগত বেঁকে যায়। আর ওই বেঁকে যাওয়াটা ঘটে কেন্দ্রের দিকে। এই কারণে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে পাক খেতে পারে।

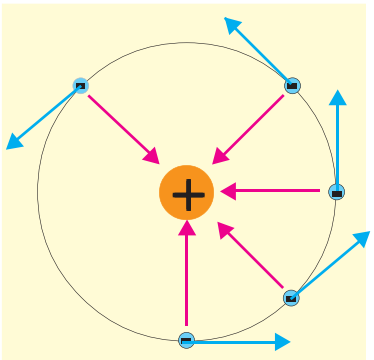

ছবিতে দেখো ইলেকট্রনের বেগ যে তির চিহ্ন (→) দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই তিরগুলো বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ বরাবর তড়িৎ আকর্ষণ বল টানছে (→) বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

সূর্যের চারদিকে গ্রহের ঘোরার সময়েও এমন ধরনের ঘটনাই ঘটে। তবে সেখানে তড়িৎ আকর্ষণ বল থাকে না, তার বদলে থাকে মহাকর্ষ বল।

1.3 তাপ

তাপের পরিমাপ ও একক

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণের উপর, বস্তুর ভরের উপর ও বস্তু কোন উপাদান দিয়ে তৈরি তার উপর।

বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে

i) বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ
ii) বস্তুর ভর
iii) বস্তুর উপাদান

বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির ওপর কীরকমভাবে নির্ভর করে সে সম্বন্ধে আমরা আরো বিশদভাবে এবার জানব।

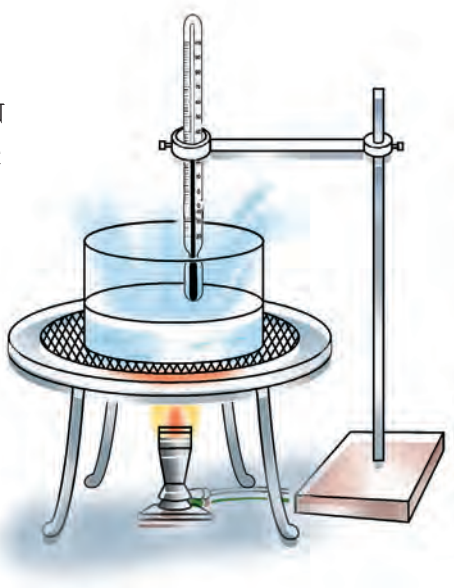

i) তোমরা জেনেছ নির্দিষ্ট ভরের জলের উষ্ণতা 25°C বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন, ওই একই ভরের জলের উষ্ণতা 50°C বাড়াতে তার দ্বিগুণ তাপ প্রয়োজন।

একইভাবে, 1 কাপ জলের 1°C উষ্ণতা বাড়াতে যতটা তাপ লাগবে, 2°C উষ্ণতা বাড়াতে তার 2 গুণ তাপ লাগবে। তাহলে 3°C উষ্ণতা বাড়াতে তার কত গুণ তাপ লাগবে?

ii) তোমরা এটাও জেনেছ 1 কাপ জলের উষ্ণতা 1°C বাড়াতে যতটা তাপ লাগে, 2 কাপ জলের জন্য তার 2 গুণ তাপ লাগে। তাহলে 3 কাপ জলের উষ্ণতা বাড়াতে তার কত গুণ তাপ লাগবে?

এবার ধরা যাক m গ্রাম ভরের জলের উষ্ণতা t°C বাড়াতে Q পরিমাণ তাপ লাগে।

তাহলে 2m গ্রাম ভরের জলের t°C উষ্ণতা বাড়াতে 2Q পরিমাণ তাপ লাগবে।

এবং 2m গ্রাম ভরের জলের 2t°C উষ্ণতা বাড়াতে $2 \times 2Q = 4Q$ পরিমাণ তাপ লাগবে।

এবার নীচের হিসাবটিকে লক্ষ করো।

$$\frac{\text{তাপ গ্রহণ বা বর্জনের পরিমাণ}}{\text{ভর} \times \text{উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}} = \frac{4Q}{2m \times 2t} = \frac{Q}{m \times t}$$

একইভাবে

5m গ্রাম ভরের জলের উষ্ণতা $6t^{o}C$ বাড়াতে $(5 \times 6)\, Q = 30Q$ পরিমাণ তাপ লাগবে

সেক্ষেত্রে

$$\frac{\text{তাপ গ্রহণ বা বর্জনের পরিমাণ}}{\text{ভর} \times \text{উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}} = \frac{30Q}{5m \times 6t} = \frac{Q}{m \times t}$$

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একই পদার্থের (জল) জন্য $\left(\frac{\text{তাপ গ্রহণ বা বর্জনের পরিমাণ}}{\text{ভর} \times \text{উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}}\right)$ এর মান সবসময় একই থাকে, তা সেই বস্তুটির ভর ও উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ যতই বদলাক না কেন।

ধরা যাক, জলের ক্ষেত্রে ওই মান হলো k। কিন্তু পদার্থ আলাদা হলে k-এর মানও আলাদা হয়।

এখন যদি আমরা k-এর মান নির্ণয় করতে চাই আমাদের Q-এর মান জানা প্রয়োজন। কিন্তু Q বা তাপ মাপার একক তো এখনও আমরা ঠিক করিনি। তাহলে k-এর মান নির্ণয় হবে কীভাবে?

তাই চলো Q বা তাপ মাপার একক ঠিক করে নেওয়া যাক।

1 গ্রাম বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা $1^{o}C$ বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকেই আমরা একক পরিমাণ তাপ বলি। এই একক পরিমাণ তাপের নাম দেওয়া হয় 1 ক্যালোরি।

এবার দেখা যাক তাপের একক এভাবে ঠিক করার ফলে জলের ক্ষেত্রে k-র মান কত পাওয়া যায়?

$$\because \quad k = \frac{Q}{m \times t}$$

$$\therefore \quad Q = k.m.t$$

1 ক্যালোরির সংজ্ঞা অনুযায়ী $m=1$ গ্রাম, $t = 1^{o}C$ হলে জলের ক্ষেত্রে $Q=1$ ক্যালোরি।

অতএব $k = \frac{1}{1 \times 1}$

$= 1$ ক্যালোরি / গ্রাম ^{o}C

এবার চলো একটি পরীক্ষা করা যাক।

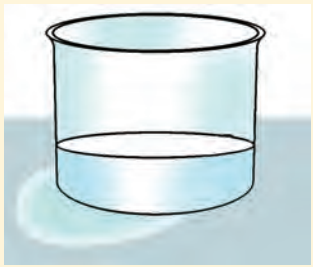

60 গ্রাম জল, 25°C উষ্ণতা

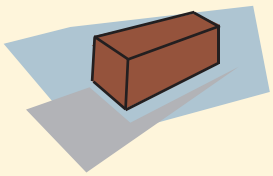

120 গ্রাম ভরের বস্তু
উষ্ণতা 100° C

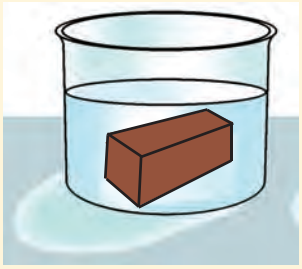

120 গ্রাম ভরের বস্তু
উষ্ণতা 50° C

এবার 25°C উষ্ণতার 60 গ্রাম জল নেওয়া হলো। 100°C উষ্ণতার 120 গ্রাম ভরের একটি বস্তুকে ওই জলে ফেলা হলো। এভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিলে জল ও বস্তুর উষ্ণতার কি কোনো পরিবর্তন হবে?

জল ও বস্তুর উভয়ের উষ্ণতাই কিছুক্ষণ পর সমান হয়ে যাবে। ধরা যাক এই উষ্ণতা 50°C।

তাহলে জলের উষ্ণতা (50–25) = 25°C বাড়বে। অর্থাৎ জল কিছু তাপ গ্রহণ করবে। আর বস্তুর উষ্ণতা (100– 50) = 50°C কমবে। অর্থাৎ বস্তু কিছুটা তাপ হারাবে।

বস্তু যতটা তাপ বর্জন করল জল ঠিক ততটাই তাপ গ্রহণ করল।

তোমরা জান $Q = m \times k \times t$.

জল যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করল, তা হলো,

$Q = 60 \times 1 \times (50-25)$ ক্যালোরি $= 1500$ ক্যালোরি

(এখানে $m = 60$ গ্রাম, $k = 1$ ক্যালোরি/গ্রাম °C ও $t = 50 - 25 = 25$°C)

এবং বস্তু যে পরিমাণ তাপ বর্জন করল,

$Q = 120 \times k \times (100 - 50)$ ক্যালোরি $= 6000\ k$ ক্যালোরি

(এখানে $m = 120$ গ্রাম, $t = 100-50 = 50$°C এবং k অজানা)

যেহেতু, বস্তুর বর্জন করা তাপ ও জলের গ্রহণ করা তাপের পরিমাণ একই, তাই লেখা যায়,

$\therefore \quad 6000\,k = 1500$

$$\therefore \quad k = \frac{1500}{6000} = 0.25$$

বস্তুটির ক্ষেত্রে $k = 0.25$, এই মান পাওয়া যাচ্ছে যখন জলের ক্ষেত্রে $k = 1$ ধরা হচ্ছে। জলের ক্ষেত্রে $k = 1$ না হয়ে অন্য কিছু ধরা হলে বস্তুটির ক্ষেত্রে k -এর মান অন্য হতো। অর্থাৎ k -এর মান আপেক্ষিক।

তাই $Q = m \times k \times t$, এই সম্পর্কটিতে k-কে বলা হয় আপেক্ষিক তাপ। t হলো উষ্ণতার পরিবর্তন ।

আপেক্ষিক তাপকে সাধারণত s দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আগের পাতার আলোচনা অনুযায়ী বিভিন্ন পদার্থের s এর মান আলাদা।

কোনো পদার্থের একক ভরের উষ্ণতা 1^{o} বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপকে ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে। $Q = m \times s \times (t_2 - t_1)$ এটি গৃহীত বা বর্জিত তাপ পরিমাপের রাশিমালা। এখানে t এর পরিবর্তে $(t_2 - t_1)$ লেখা হয়েছে, যেখানে t_1 হলো প্রাথমিক উষ্ণতা ও t_2 হলো অন্তিম উষ্ণতা। এই রাশিমালা প্রয়োগ করে নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

বস্তু বা পদার্থের উপাদানের নাম	ভর (M) গ্রাম	আপেক্ষিক তাপ(s) ক্যালোরি/গ্রাম °C	উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস $(t_2 - t_1)°C$	গৃহীত বা বর্জিত তাপ Q ক্যালোরি। $Q = m \times s \times (t_2 - t_1)$
অ্যালুমিনিয়াম	400	0.21	70-30 =	Q_1=400×0.21×40 =3360
তামা	100	0.09	90-50 =	Q_2 =
সিসা	600	0.03	80-25 =	Q_3 =
রুপো	80	0.05	35-25 =	Q_4 =

অবস্থার পরিবর্তন ও লীনতাপের ধারণা

তাপ প্রয়োগ বা নিষ্কাশনের ফলে পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে **অবস্থার পরিবর্তন** বলে।

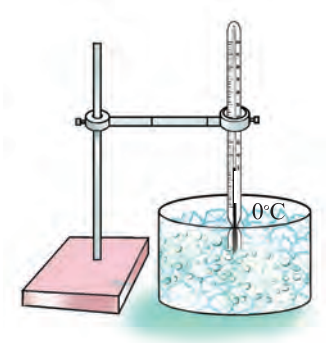

এক কাপ জলকে কিছুক্ষণ ধরে তাপ দিলে তার উষ্ণতা বেড়ে যায়। অথচ 0°C উষ্ণতার একখণ্ড বরফকে তাপ প্রয়োগ করে গলতে দিলে বরফটি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার আগে যদি তার উষ্ণতা মাপা হয় তবে দেখা যায় সেই উষ্ণতা 0°C ই রয়েছে। এখানে বরফ তাপ গ্রহণ করে জলে পরিণত হয়েছে কিন্তু তার উষ্ণতার পরিবর্তন হয়নি। ঘটনাটিকে বলে **গলন**।

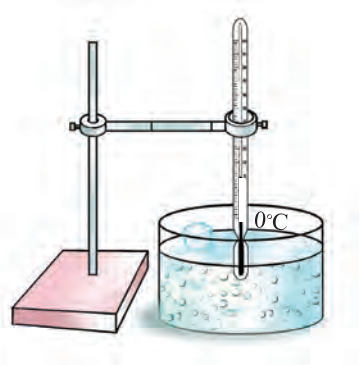

এভাবে বেশিরভাগ কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা গলে তরলে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রেও ঘটনাটি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটে। এক এক ধরনের কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা এক এক রকমের হয়। এই নির্দিষ্ট উষ্ণতা ওই কঠিন পদার্থগুলির গলনাঙ্ক।

তোমরা দেখেছ যে গলানো মোমকে তরল অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা নিজে নিজেই জমে শক্ত হয়ে যায়। আবার ফ্রিজে রাখা জল জমে বরফ হয়, তাও তোমরা জানো। তরল পদার্থ জমে কঠিন হবার সময় তরলটি তাপ ছেড়ে দেয়। তরল পদার্থ তাপ বর্জন করে যখন কঠিনে পরিণত হয় সেই ঘটনাকে বলে কঠিনীভবন। অবস্থার এই পরিবর্তনের সময়েও তরলটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না।

তরল পদার্থ তাপ বর্জন করলে তা একসময়ে জমে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রেও ঘটনাটি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটে। এক এক ধরনের তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা এক এক রকমের হয়। ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতা ওই তরল পদার্থগুলির হিমাঙ্ক।

পাশের সারণিতে কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক দেখানো হয়েছে। লক্ষ করে দেখো যে পদার্থগুলির গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের মান সমান।

পদার্থ	গলনাঙ্ক	হিমাঙ্ক
	°C	°C
পারদ	– 39.5	– 39.5
বরফ	0	0
সোনা	1063	1063
তামা	1083	1083
ঢালাই লোহা	1200 (প্রায়)	1200 (প্রায়)

কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক

মনে রাখবে,

কাচ, মাখন, চর্বি, মোম, পিচ ইত্যাদির কোনো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক থাকে না। এইসব পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের মান সমানও হয় না।

গলনে ও কঠিনীভবনে আয়তনের পরিবর্তন

কঠিন থেকে তরলে পরিণত হলে কোনো পদার্থের আয়তন বাড়বে না কমবে?

যদি তরল কঠিনে পরিণত হয় তবে আয়তন কমবে না বাড়বে?

নির্দিষ্ট ভরের কোনো পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় আয়তন কমলে ওই পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে। ফলে কঠিনীভবনের পর পদার্থের ঘনত্ব সাধারণত বাড়ে।

চলো এবার একটি পরীক্ষা করা যাক।

দুটি টেস্টটিউবের একটিতে কিছুটা মোম এবং অন্যটিতে একটা বরফের টুকরো নেওয়া হলো। দুটি টেস্টটিউবকে গরম করে মোম ও বরফকে গলানো হলো। এবার যে টেস্টটিউবে গলানো মোম আছে তাতে একটা ছোটো মোমের টুকরো ফেলে দাও, আর যে টেস্টটিউবে জল আছে তাতে একটা বরফের টুকরো ফেলে দাও। কী দেখা গেল?

পাশের 1নং চিত্রের মতো কঠিন মোমের টুকরো তরল মোমের মধ্যে ডুবে যাবে। যদিও গরম তরল মোমের সংস্পর্শে কঠিন মোমের টুকরো খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে। কিন্তু 2 নং চিত্রের মতো বরফের টুকরো বরফগলা জলের উপর ভেসে থাকবে।

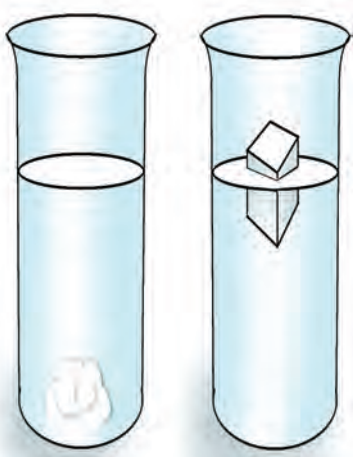

চিত্র 1 চিত্র 2

কঠিন মোমের ঘনত্ব তরল মোমের ঘনত্বের তুলনায় বেশি। কিন্তু কঠিন বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের তুলনায় কম।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

তরল মোম কঠিন মোমে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে। এই ঘটনার সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে।

শীতপ্রধান দেশে মোটরের রেডিয়েটারে থাকা জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বেড়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে ওই পাইপ ফেটে যায়। শীতের দেশে বাড়ির জল সরবরাহের পাইপগুলিও কখনো-কখনো ফেটে যায়।

এই কারণে পাথরের মাঝখানে থাকা জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বেড়ে যায়। এতে অনেক সময় পাথর ফেটে যায়। এই কারণেও পাহাড়ে মাঝে মাঝে ধস নামে।

আবার বরফের ঘনত্ব জলের তুলনায় কম। জলের উপর বরফ ভেসে থাকে। বরফের তলায় জল থাকে। তাতে মাছেরা বেঁচে থাকে।

কোনো কোনো তরল কঠিনে পরিণত হলে আয়তনে বেড়ে যায় অর্থাৎ ঘনত্ব কমে যায়। এইরকম আরো কয়েকটি পদার্থ হলো ঢালাই লোহা, পিতল ইত্যাদি।

বাড়িতে যদি ছাঁচে ঢালা ধাতুর তৈরি মূর্তি থাকে তাহলে জানার চেষ্টা করোতো মূর্তিটি কোন ধাতু দিয়ে তৈরি। ধাতু গলিয়ে আর ছাঁচে ঢেলে যে মূর্তিগুলি তৈরি করা হয় তা বিশেষ ধাতু ব্যবহার করে তৈরি করা হয় কেন?

এবার দেখা যাক, কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক কীভাবে বদলায়।

বরফের দুটি টুকরোকে একসঙ্গে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলে তারা জোড়া লেগে যায়। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু কেন এমন হয়?

বরফের গলনের ফলে যে জল উৎপন্ন হয়, তার আয়তন বরফের আয়তনের তুলনায় কমে যায়। চাপ বাড়ালে গলনে সাহায্য হয়। তাই চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। ফলে চেপে ধরার সময় দুটি বরফের সংযোগস্থলে গলনাঙ্ক কমে ও বরফ গলে জল হয়। যখন চাপ সরিয়ে নেওয়া হয় তখন গলনাঙ্ক আবার বাড়ে ও গলে যাওয়া অংশ আবার বরফে পরিণত হয়। ফলে বরফের টুকরো দুটো জুড়ে যায়।

গলনের সময় বরফ, ঢালাই লোহা ইত্যাদি পদার্থের আয়তন কমে। এইসব পদার্থের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক কমে যায়। অর্থাৎ বেশি চাপে ওরা কম উষ্ণতায় গলে।

গলনাঙ্ক যেহেতু চাপ বাড়লে বা কমলে বদলে যায়, তাই কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ধারণ করার সময় চাপ কত ছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক 76 সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান

চাপে নির্ধারণ করা হয় তবে তা হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পদার্থটির গলনাঙ্ক। একে পদার্থটির স্বাভাবিক গলনাঙ্ক বলে। এইভাবে স্বাভাবিক হিমাঙ্কও ঠিক হয়।

বরফের উপরে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান পরিমাণ চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক প্রায় 0.0007°C কমে যায়।

গলনের সময় সিসা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পদার্থের আয়তন বাড়ে। এদের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়, অর্থাৎ ওরা আগের চেয়ে বেশি উষ্ণতায় গলে।

গলনের সময় মোম প্রসারিত হয়। চাপ বাড়ালে গলন প্রক্রিয়া বাধা পায়, তাই গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান পরিমাণ চাপ বাড়ালে মোমের গলনাঙ্ক প্রায় 0.04°C বেড়ে যায়।

বৈদ্যুতিক লাইনে যে ফিউজ তার ব্যবহার করা হয়, তার গলনাঙ্ক খুব কম হওয়া দরকার। প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে তার উত্তপ্ত হয়ে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক কম হওয়ায় ওই তার অল্প উত্তাপেই গলে যায় ও তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ওই ফিউজ তার সিসা ও টিন মিশিয়ে তৈরি করা হয়। সিসা ও টিনের মিশ্র ধাতুর গলনাঙ্ক সিসা ও টিন দুটি ধাতুরই গলনাঙ্কের তুলনায় কম হয়।

চলো এবার একটি পরীক্ষা করা যাক।

দুটি বাটিতে দুটি একই আকৃতি ও আয়তনের বরফ রাখো। যে-কোনো একটি বাটিতে বরফের গায়ে নুন ছড়িয়ে দাও। দেখোতো দুটি বরফ একইসঙ্গে গলে জল হলো কিনা? ভেবে বলোতো নুন মেশানোর ফলে বরফের গলনাঙ্ক বেড়েছে না কমেছে?

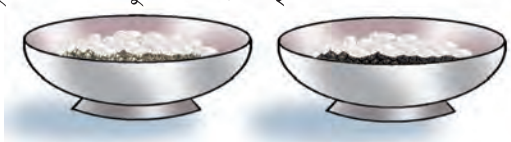

হিমমিশ্র : বরফের সঙ্গে নুন মেশালে মিশ্রণের উষ্ণতা কমে। এই কম উষ্ণতার মিশ্রণ মাছ সংরক্ষণে, ওষুধ ঠান্ডা অবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হয়। বরফ ও নুন নির্দিষ্ট ভরের অনুপাতে মিশিয়ে হিমমিশ্র তৈরি করা হয়।

এবার ভেবে বলোতো, পদার্থের গলনাঙ্ক কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

সপ্তম শ্রেণিতে আমরা জেনেছি যে উষ্ণতার পরিবর্তন না করে যখন কোনো পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য কোনো অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তখন ওই পদার্থ কিছু পরিমাণ তাপ নেয় বা ছেড়ে দেয়। একক ভরের পদার্থের ক্ষেত্রে তাপের ওই পরিমাণকে বলা হয় অবস্থার পরিবর্তনের **লীনতাপ**।

বরফ গলনের লীনতাপ 80 ক্যালোরি/ গ্রাম। এর অর্থ হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 0°C উষ্ণতার 1 গ্রাম বরফকে 0°C উষ্ণতার 1 গ্রাম জলে পরিণত করতে 80 ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করতে হবে।

- বরফের টুকরোর মধ্যে গর্ত করে জল রাখলে ওই জল জমে বরফ হয় না কেন?

তোমরা জেনেছ, 0°C উষ্ণতার 1 গ্রাম জলকে 0°C উষ্ণতার 1 গ্রাম বরফে পরিণত করতে হলে জল থেকে 80 ক্যালোরি তাপ নিষ্কাশন করা প্রয়োজন।

0°C উষ্ণতার জল থেকে তাপ শোষণ করতে পারবে সেই বস্তু যার উষ্ণতা 0°C-এর কম। বরফের টুকরোর মধ্যে গর্ত করে যে জল রাখা হলো, তার উষ্ণতা প্রথমে ঘরের উষ্ণতার সমান ছিল অর্থাৎ 0°C-এর বেশি।

এবার কে তাপ নেবে? জল না বরফ? কিছুটা বরফ জল থেকে তাপ নিয়ে গলে

যাবে। কিন্তু বরফের উষ্ণতা 0°C ই থাকবে। জল থেকে তাপ চলে যেতে যেতে একসময় জলের উষ্ণতা হবে 0°C। এবার, জল ও বরফ দুয়ের উষ্ণতাই 0°C।

এবার কি জল থেকে বরফ আর তাপ শোষণ করতে পারবে? জল যেহেতু লীনতাপ বর্জন করতে পারবে না তাই তা কঠিনও হবে না।

বাষ্পীভবন

জল দিয়ে হাত ধুলে। ধোয়া হাত না মুছে খোলা হাওয়ায় ধরে রাখলে। কিছুক্ষণ পর হাত শুকিয়ে যায়। হাতে লেগে থাকা জল কোথায় যায়? একটি পাত্রে জল নিয়ে তা উনুনে বসিয়ে ফোটাতে থাকলে একসময় সমস্ত জল ফুটতে ফুটতে শেষ হয়ে যায় ও পাত্রটি খালি হয়ে যায়। এই জলই বা কোথায় যায়?

তোমাদের জানা আছে ওই জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। একই কারণে ভিজে যাওয়া জামাকাপড় শুকিয়ে যায়। জল দিয়ে ঘর মুছলে তাও শুকিয়ে যায়। নদী-নালা, পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়।

কিন্তু আমরা জানি জল বাষ্পে পরিণত হতে হলে জলকে তাপ গ্রহণ করতে হয়। হাতে লাগা তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য বাইরে থেকে আলাদা করে আমরা তাপ প্রয়োগ করিনি। ওই তরল সম্ভবত চারপাশ থেকে বা নিজের মধ্য থেকেই দরকারি তাপ পেয়ে গেছে। খেয়াল করলে দেখবে এই পদ্ধতিতে জল বাষ্পীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটা খুবই মন্থর।

শুধু জলই যে এভাবে বাষ্পীভূত হয় তা নয়। স্পিরিট বা ওই ধরনের কোনো উদ্‌বায়ী তরল এই পদ্ধতিতে খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়। যে-কোনো উষ্ণতায় কোনো তরলের উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে রূপান্তরিত হবার এই ঘটনাকে বলে **বাষ্পায়ন**।

দুটি একই মাপের কাপড়কে একই রকমভাবে জলে ডোবাও। দুটি টুকরোকেই একই রকম ভাবে নিংড়ে নাও। এবার একটি কাপড়ের টুকরোকে কয়েকটি ভাঁজ করে শুকোতে দাও। তার পাশে অন্য কাপড়ের টুকরোটিকে না ভাঁজ করে সম্পূর্ণ খুলে শুকোতে দাও।

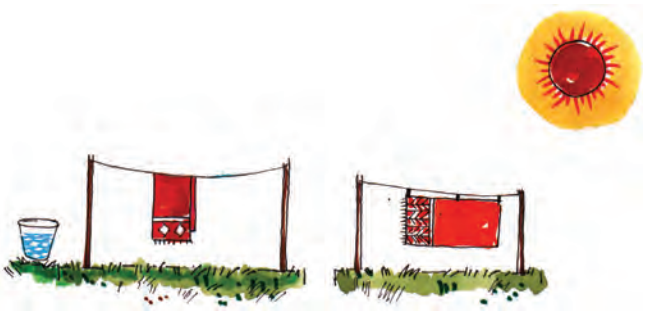

- কোন কাপড়টা আগে শুকিয়ে গেল? তাহলে বলা যেতে পারে ওই জল তার উপরিতল থেকে বাষ্পে পরিণত হয়েছে। তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বাড়ে তরল তত তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়।
- বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। কিন্তু শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকে। শীতকালে ভিজে জামাকাপড় থেকে জল তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে যায় বলে ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এছাড়াও বাষ্পায়নের হার তরলের উপরের চাপ, বায়ু চলাচল প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে।

- **তবে এবার দেখা যাক বাষ্পায়ন সম্বন্ধে আমরা কী কী জানলাম—**

(1) যদি তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেশি হয় তবে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

(2) বাষ্পায়ন হবার জন্য কোনো বিশেষ উষ্ণতা অর্জনের প্রয়োজন হয় না। তরলের উষ্ণতা বেশি হলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

(3) তরলের ওপর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

(4) তরলের প্রকৃতির ওপর বাষ্পায়নের হার নির্ভর করে। যেমন স্পিরিট খুব তাড়াতড়ি বাষ্পীভূত হয়।

● **গরমকালে ঘামে ভেজা শরীরে হাওয়ার সামনে দাঁড়ালে আরাম হয়। কেন?**

সেইসময় ঘাম কি শুকিয়ে যায়?

ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার অর্থ ঘামের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়া।

ওই জলের এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কীসের দরকার?

বাষ্প হবার জন্য যে তাপের দরকার হয়, তা ওই জল কোথা থেকে শোষণ করবে?

জলের বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ দেহ থেকে শোষিত হলে দেহে শীতলতার অনুভূতি হয়। তাই আরাম লাগে।

এই একই কারণে হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢাললে খুব ঠান্ডা বোধ হয়।

● গ্রীষ্মকালে কুকুরকে জিভ বার করে লালা ঝরাতে তোমরা অনেকেই দেখেছো। জিভের ওপরের ভেজা তল থেকে জল বাষ্পীভূত হয়। জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ জিভ থেকেই সংগৃহীত হয়। কুকুরের দেহ ঠান্ডা রাখার এটি অন্যতম একটি উপায়।

এবার ভেবে বলোতো,

পারদ থার্মোমিটারের কুণ্ডে ভিজে কাপড় জড়িয়ে রাখলে থার্মোমিটারের পাঠ কমে যায় কেন?

স্ফুটন

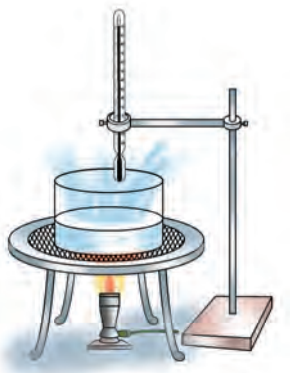

তোমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানো যে একটি পাত্রে জল নিয়ে তা যদি জ্বলন্ত উনুনের উপর রাখো, তাহলে জল ফুটতে শুরু করে ও খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। জল যখন টগবগ করে ফোটে তখন সমগ্র জলের মধ্যেই একটা উথাল-পাথাল অবস্থা চলতে থাকে, কিন্তু থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ওইসময় জলের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না।

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সমগ্র অংশ থেকে অতি দ্রুত বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়াকে **স্ফুটন** বলা হয়।

যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটন শুরু হয় ও যতক্ষণ স্ফুটন চলে ততক্ষণ ওই উষ্ণতা স্থির থাকে, সেই উষ্ণতাকে ওই তরলের **স্ফুটনাঙ্ক** বলা হয়।

● **তরলের স্ফুটনাঙ্ক যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:**

(1) তরলের প্রকৃতি। বিভিন্ন তরলের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন।

(2) তরলে দ্রবীভূত পদার্থের উপস্থিতি। তরলে যদি কোনো পদার্থ দ্রবীভূত করা হয়, সাধারণত তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। যেমন বিশুদ্ধ জল ফোটে 100°C তাপমাত্রায়। কিন্তু জলে নুন মেশালে সেই দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক জলের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বাড়ে।

কয়েকটি তরলের স্ফুটনাঙ্ক

পদার্থের নাম	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
জল	100
ডাই ইথাইল ইথার	35
পারদ	357
তরল হাইড্রোজেন	-253

(3) তরলের উপরিস্থিত চাপ। স্ফুটনের সময় তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হলে তার আয়তন বেড়ে যায়।

এবার ভেবে বলো, চাপ বাড়ালে স্ফুটন প্রক্রিয়া বাধা পাবে না কি স্ফুটন প্রক্রিয়ায় সাহায্য হবে?

চাপ বাড়ালে স্ফুটন প্রক্রিয়া বাধা পায় বলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। ফলে কোনো পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ঠিক করার সময় তা একটি নির্দিষ্ট চাপে ঠিক করা হয়। যেমন প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C।

রান্নার সময় পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে চেপে রান্না করলে খাদ্যবস্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। কেন?

পাত্রের ঢাকনা তার মধ্যে উৎপন্ন জলীয় বাষ্পকে কি বের হতে দেবে?

পাত্রের মধ্যে যত বাষ্প জমা হতে থাকবে জলীয় বাষ্পের চাপ তত বাড়তে থাকবে। এতে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যাবে এবং জল খোলা হাওয়ায় যে উষ্ণতায় ফুটত তার চেয়ে বেশি উষ্ণতায় ফুটবে। ফলে খাদ্যবস্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে। প্রেসার কুকার যন্ত্রে এই নীতি অনুযায়ী 100°C উষ্ণতার থেকে বেশি উষ্ণতায় জল ফোটানো হয়। ফলে খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

তরলের উপর চাপ কমালে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কি বেড়ে যাবে না কি কমে যাবে?

স্ফুটনের সময় চাপ কমালে তরলের অবস্থার পরিবর্তন কি বাধা পাবে না সহজ হবে?

তরলের চাপ কমালে তরলের বাষ্পে রূপান্তরে সুবিধা হয়, ফলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়।

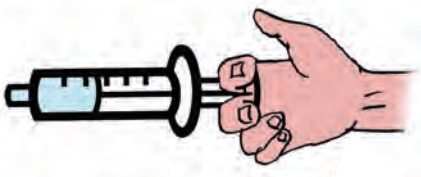

ওষুধের দোকানে যে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পাওয়া যায় তা একটা জোগাড় করো। এবার তার সুচটা সরিয়ে রাখো। ওই ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মুখটা জলে ডুবিয়ে অন্য পাশের পিস্টনটা যদি তোমার দিকে টানো তাহলে পিস্টনটা দিয়ে জল সিরিঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করবে। তারপর যদি ওই পিস্টনটা আবার উলটো দিকে ঠেলো তবে জল আবার বেরিয়ে যাবে। এবার মা যখন জল গরম করে চা করেন, জলটা ফুটতে শুরু হবার আগেই ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা দিয়ে সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে নাও।

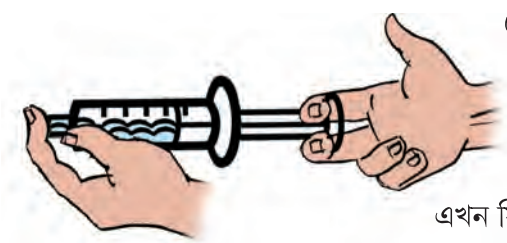

এবার সিরিঞ্জের মুখটা ছবির মতো আঙুল দিয়ে বন্ধ করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জের পিস্টনটা পিছনের দিকে টেনে দেখোতো জল ফুটতে শুরু করল কিনা?

এখন সিরিঞ্জের ভিতরের জলের উষ্ণতা তো 100°C-এর চাইতে কম। তা সত্ত্বেও ওই জল ফুটতে শুরু করল কেন?

সিরিঞ্জের সুচোলো মুখ আঙুল দিয়ে আটকে, পিস্টন ধরে টানার সময়, সিরিঞ্জের ভিতরের বাষ্প প্রসারিত হয়। তার আয়তন বেড়ে যায়, ফলে চাপ কমে যায়। কম চাপে স্ফুটনাঙ্ক কমে যাওয়ার একটি সুন্দর উদাহরণ হলো সিরিঞ্জের জলের ফুটতে শুরু করা।

উষ্ণতা স্থির রেখে স্ফুটনাঙ্কে কোনো তরলের একক ভরকে বাষ্পীভূত করার জন্য যে তাপের প্রয়োজন, সেই তাপকে ওই তরলের স্ফুটনের লীনতাপ বলা হয়।

স্টিমের লীনতাপ 537 ক্যালোরি/গ্রাম বলতে বোঝায় প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 100°C উষ্ণতায় এক গ্রাম জলকে একই উষ্ণতায় এক গ্রাম স্টিমে রূপান্তরিত করতে 537 ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করতে হয়।

ঘনীভবন

কাচের গ্লাসের ভিতর বরফ রাখলে কাচের গ্লাসের বাইরে জলকণা তৈরি হয়। এটি বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। বাষ্প থেকে তরল হওয়ার ঘটনাকে বলে **ঘনীভবন**।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন হয় বলেই মেঘ, শিশির, কুয়াশা তৈরি হয়।

মেঘ : পুকুর, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, ভিজে মাটি, ও জীব দেহ থেকে জল বাষ্পীভূত হয়। এই জলীয় বাষ্প মেশে পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি উষ্ণ বায়ুর সঙ্গে। উষ্ণ ও বেশি জলীয় বাষ্পে ভরা বায়ু শীতল ও কম জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর তুলনায় হালকা। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু তাই উপরের দিকে উঠতে থাকে। উচ্চতা বাড়লে চাপ কমে যায় বলে ওই বায়ুর কণাগুলির নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে ও বায়ু শীতল হয়। তখন বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্প বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও অন্যান্য কণাকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয় ও জলকণারূপে তা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একেই আমরা মেঘ বলি।

জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত বায়ু : একটি চা খাওয়ার কাপে কিছুটা জল নিয়ে তাতে অল্প খাবার নুন মেশাও। একটি চামচ দিয়ে নাড়ো। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবে, নুনের কঠিন দানাগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ নুন জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে গেলো। এভাবে ওই দ্রবণে নুন গুলতে থাকলে নিশ্চয়ই একটা সময় আসবে যখন ওই পরিমাণ জলে যতটা নুন গুলতে পারে ততটাই নুন গুলে যাবে। ওই দ্রবণকে তখন বলা হয় নুনের সম্পৃক্ত দ্রবণ। এবার আরো নুন মেশালে তা ওই দ্রবণের তলায় থিতিয়ে পড়বে। কিন্তু ওই দ্রবণটিতে যদি আবার কিছুটা জল মিশিয়ে দাও তবে ওই নুন আবার ওই দ্রবণের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। অথবা যদি দ্রবণের উষ্ণতা বাড়িয়ে দাও তাহলেও ওই নুন দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। এবার ধরো তোমাকে 50°C উষ্ণতার সম্পৃক্ত নুনের দ্রবণ দেওয়া হলো। তুমি ওই দ্রবণের উষ্ণতা ধীরে ধীরে কমাতে থাকলে।

কী হবে ভেবে বলোতো? নিশ্চয়ই কিছুটা নুন থিতিয়ে পড়বে।

একইভাবে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো বায়ু যদি তাতে সবচেয়ে বেশি যতটা পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে তা দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই বায়ু জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছে বলা যায়।

কুয়াশা : শীতকালে ভোরবেলায় কুয়াশা দেখা যায়। বেলা বাড়তে থাকলে একসময় কুয়াশা মিলিয়ে যায়। রাতে বাতাস প্রায় স্থির থাকলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অনেকখানি জায়গার বায়ু ধীরে ধীরে শীতল হয়ে জলীয় বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ওই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার উপর জলকণারূপে জমা হয়ে ভাসতে থাকে। একেই কুয়াশা বলে।

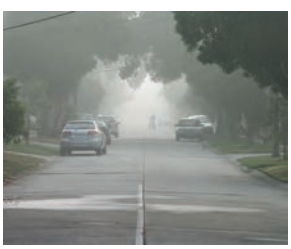

কুয়াশা

তাহলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা মিলিয়ে যায় কেন? বড়ো বড়ো শহরে বা শিল্পাঞ্চলে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় কেন?

শিশির : শীতকালে ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গাছের পাতা বা ঘাসের ডগায় শিশির জমে থাকতে তোমরা অনেকেই দেখেছ। সন্ধেবেলায় শিশির পড়ে না অথচ গভীর রাতে বা ভোরের দিকে শিশির পড়ে কেন?

দিনের বেলায় সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি বস্তুগুলি উত্তপ্ত হয়। ফলে ওই বস্তুগুলির সংলগ্ন বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়। সূর্যাস্তের পর ভূপৃষ্ঠ তাপ বর্জন করে ঠান্ডা হতে শুরু করে। তখন ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরও ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে। উষ্ণতা কমতে থাকলে একসময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু জলীয় বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে । উষ্ণতা আরো কমলে কী হবে বলোতো? যেভাবে জল থেকে নুন থিতিয়ে পড়েছিল সেভাবে বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প জলকণা হিসেবে আলাদা হয়ে শিশির তৈরি হবে। শিশির পড়ার জন্য এই উপযুক্ত অবস্থা তৈরি হতে বেশ কিছু সময় লাগে। তাই সন্ধেবেলায় শিশির পড়ে না অথচ গভীর রাতে শিশির পড়ে।

তাপের প্রবাহ : পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ

ফুটন্ত জলের মধ্যে একটা কাঠের স্কেল ডুবিয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই কাঠের স্কেলের যে দিকটা জল থেকে বেরিয়ে আছে সেই দিকটা হাত দিয়ে ধরতে পারা যাবে কি?

ওই ফুটন্ত জলে একটি স্টিলের চামচের এক প্রান্ত ডোবালে কিছুক্ষণ পর অন্য প্রান্তটা ধরে থাকা যাবে কি? কাঠের স্কেলের একপ্রান্তের উষ্ণতা বেশি ও অন্যপ্রান্তের উষ্ণতা কম থাকা সত্ত্বেও বেশি গরম প্রান্ত থেকে কম গরম প্রান্তে খুবই কম তাপ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে কাঠের স্কেলের অন্য প্রান্তটি ধরে থাকা গেছে। কিন্তু স্টিলের চামচের বেশি উষ্ণতার প্রান্ত থেকে কম উষ্ণতার প্রান্তে অনেক বেশি তাপ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে কম গরম প্রান্তটিও ধীরে ধীরে অনেক গরম হয়ে গেছে ও ধরে থাকা যায়নি। একই বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের তাপ গ্রহণ তাপের প্রবাহের জন্য সম্ভব হয়।

অতএব দেখা গেল যে কাঠের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হতে পারে না, কিন্তু স্টিলের মধ্য দিয়ে তাপ সহজেই প্রবাহিত হয়।

কোনো কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহিত হওয়ার এই পদ্ধতিটির নাম **পরিবহণ**। এই পদ্ধতিতে পদার্থটির নিজের কোনো সরণ হয় না, বা পদার্থটির কোনো কণার কোনো সরণ হয় না, শুধু তাপ একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হতে পারে তারা তাপের সুপরিবাহী। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হতে পারে না তারা তাপের কুপরিবাহী।

তামা, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল তাপের সুপরিবাহী। তাই রান্না করার পাত্র এইসব ধাতু দিয়ে তৈরি হয়।

নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

	রান্না করার পাত্রের নাম	তাপের সুপরিবাহী করবার জন্য কী বা কী কী ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে	পাত্রটি গরম অবস্থায় ধরবার জন্য তাপের কুপরিবাহী কী কী পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে।

- **তাপের সুপরিবাহী পদার্থ ও কুপরিবাহী পদার্থ নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা।**

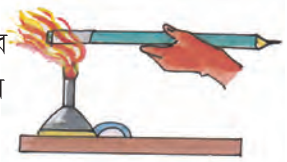

একটি কাঠের তৈরি পেনসিল নাও। তার একটা প্রান্তে একটা পাতলা কাগজকে একবার জড়াও। আগুনের শিখায় পেনসিলের ওপর জড়ানো কাগজটাকে ধরো। দেখবে কাগজের টুকরোটা খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে গেল।

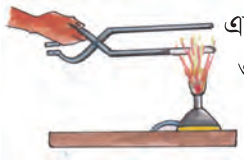

এবার ধাতুর তৈরি কোনো দণ্ড যেমন সাঁড়াশির হাতল, খুন্তির হাতল ইত্যাদি নাও। তার ওপর ওই একই ধরনের একটা পাতলা কাগজ একবার জড়াও। আগের মতো করে আগুনের শিখায় ধাতুর ওপর জড়ানো কাগজটাকে ধরো। দেখবে এবার কিন্তু কাগজের টুকরোটা পেনসিলের ওপরে জড়ানো কাগজের টুকরোর মতো অত তাড়াতাড়ি পুড়ে গেল না।

এরকম হয়, কারণ ধাতু তাপের সুপরিবাহী। ধাতু জ্বলন্ত শিখা থেকে তাপ নিয়ে তা দ্রুত দূরে পাঠিয়ে দেয়। তাই ধাতুর ওপর জড়ানো কাগজ গরম হতে দেরি হয়। তাই কাগজটা তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে না।

- **তাহলে কাঠের ওপরের কাগজ কেন তাড়াতাড়ি পুড়ে গেল তা বোঝার চেষ্টা করো।**

খাতার পৃষ্ঠার মাপে পাতলা কাগজের টুকরোকে চার ভাঁজ করা হলো। তার তিনটি ভাঁজকে একদিকে রেখে তার মাঝখানে সামান্য কিছুটা জল রাখা হলো। আগুনের শিখায় জল সহ কাগজের পাতলা দিকটা ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই জল ফুটতে থাকে অথচ কাগজে আগুন ধরেনি। কাগজ জ্বলার জন্য কমপক্ষে যত উষ্ণতা প্রয়োজন তা জলের স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় অনেক বেশি। যে কাগজের টুকরোটি ব্যবহার করা হয়েছে তা খুব পাতলা হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে তাপ খুব তাড়াতাড়ি জলে প্রবাহিত হয়। ফলে জল ফুটতে থাকে কিন্তু ওই উষ্ণতায় কাগজ পোড়ে না।

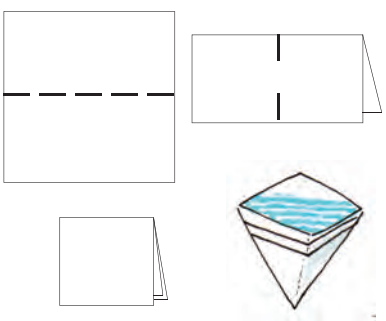

মোটা কাগজের এই ধরনের ঠোঙা বানিয়ে তার মধ্যে জল রেখে আগের পরীক্ষাটি করলে কাগজটা পুড়ে

যাবে। মোটা কাগজের মধ্যে দিয়ে তাপ তাড়াতাড়ি জলে যেতে পারবে না। ফলে আগুনের শিখার সংস্পর্শে থাকা কাগজের অংশের উষ্ণতা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে এমন হবে যে কাগজটি পুড়ে যাবে।

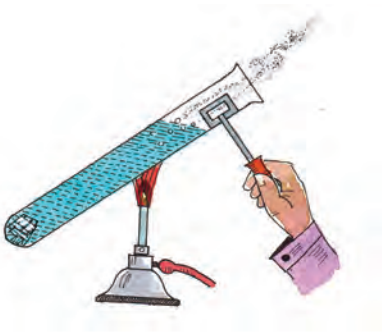

একটি টেস্টটিউবের চারভাগের তিনভাগ জল দিয়ে ভরতি করা হলো। একটি বরফের টুকরোর গায়ে লোহার তার জড়িয়ে টেস্টটিউবের জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। লোহার তারের ভর এমন হওয়া দরকার যাতে বরফের টুকরোটি জলে ডুবে যায়। ছবির মতো করে টেস্টটিউবে রাখা জলের উপরিতলকে তীব্র আগুনের শিখায় ধরে তা যতক্ষণ না ফুটছে ততক্ষণ গরম করা হলো। কী পর্যবেক্ষণ করা যাবে? টেস্টটিউবে রাখা জলের উপরিতল যখন ফুটে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে, তখন ওই টেস্টটিউবের নীচে পড়ে থাকা বরফ কি দ্রুত গলে যাচ্ছে? দেখা যায় টেস্টটিউবের ওপরে থাকা জল যখন ফুটছে টেস্টটিউবের তলায় থাকা বরফ প্রায় গলছেই না। তাহলে জল কি তাপের সুপরিবাহী?

তোমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আছে শীতকালে সুতোর তৈরি একটা মোটা জামা পরলে গরম লাগে। কিন্তু তার বদলে একই ধরনের সুতো দিয়ে তৈরি দুটি পাতলা জামা পরলে আরও বেশি গরম লাগে। এখন কেন বেশি গরম লাগে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

বরফ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, বরফের গায়ে কাঠের গুঁড়ো মাখানো হয়। কখনো-কখনো চট জড়িয়ে দেওয়া হয়। কাঠের গুঁড়োর মাঝখানে যে জায়গা থাকে তাতে বায়ু ঢুকে যায়। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। কাঠের গুঁড়ো বা চটও তাপের কুপরিবাহী। বাইরের থেকে তাপ কাঠের গুঁড়োর ভেতর দিয়ে বরফের মধ্যে যেতে পারবে না, তাই বরফ গলতে পারে না।

হাতি গায়ে ধুলো মাখে। তার একটা কারণ হলো, ধুলো মাখলে, ধূলোর কণাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বায়ু আটকে থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। তাই দেহ থেকে বেরিয়ে আসা তাপ বায়ু দিয়ে ভালোভাবে পরিবাহিত হতে পারে না। তাই শীতকালে হাতির আরাম লাগে।

- শীতকালে আমরা উলের তৈরি পোশাক পরি কেন?
- শীতকালে গায়ে কম্বল চাপা দিলে আরাম লাগে কেন?
- শীতকালে পাখিরা কখনো-কখনো পালক ফুলিয়ে বসে থাকে কেন?

খেয়াল করলে বোঝা যায় ওপরের সব ক্ষেত্রেই বায়ু তাপের কুপরিবাহী বলে তাপ সঞ্চালন হয় না।

বাড়ি বানানোর উপাদানগুলি তাপের কুপরিবাহী হওয়া দরকার।